সংগ্রামী হাতিয়ার-এর গ্রাহক হোন

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

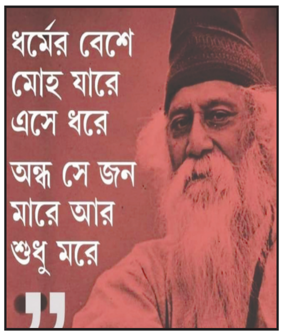

নবম ও দশম সংস্করণ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ■ ৫১তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

পাহাড় থেকে সাগর অধিকার যাত্রা

রচিত হল কর্মচারী আন্দোলনের নয়া ইতিহাস

১০ই জানুয়ারি '২৪ ভার্চুয়াল রাজ্য কাউন্সিল সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যত মাত্র দেড় মাস সময়ের প্রস্তুতিতে কার্যকরী হল 'অধিকার যাত্রা'-র কর্মসূচী। অভূতপূর্ব এই কর্মসূচী পেল অসাধারণ সাফল্য। ১৭ই ফেব্রুয়ারি '২৪ থেকে ১০ই মার্চ '২৪—এই ২৩ দিনে কোচবিহার থেকে শুরু করে রাজ্যের সবক'টি জেলা পরিক্রমা করে এই অধিকার যাত্রা। এই কর্মসূচীকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। শুধু কর্মচারী বা অবসরপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়, সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে আবৃত করে পথ হেঁটেছে এই 'অধিকার যাত্রা'। সংহতি ও সম্বর্ধনা জানিয়ে সামিল হয়েছে শ্রমিক, শিক্ষক কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন পথচলতি সাধারণ মানুষকেও নাড়া দিয়েছে। প্রায় ৩৬০০ কিলোমিটারের এই অধিকার যাত্রা কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ইতিহাসে নানাধরনের সাহসী কর্মসূচীর নজীর রয়েছে, কিন্তু এই ধরনের কর্মসূচী এই প্রথম। রাজ্য প্রশাসনের নানা বাধাকে অতিক্রম করে এই কর্মসূচীর সাফল্য এসেছে। প্রতিটি জেলাতেই নবীন কর্মচারীদের একটা অংশ যুক্ত হয়েছে এই যাত্রায়। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরাও ব্যাপক সংখ্যায় ছিলেন এই যাত্রায়। এই অধিকার যাত্রার সমাপ্তি হয় যাদবপুরে কেন্দ্রীয় সমাবেশের মধ্য দিয়ে।

*এই যাত্রায় কোচবিহারের সিতাইয়ে সূচনা থেকে কলকাতার যাদবপুরের সমাপ্তি সমাবেশ পর্যন্ত টানা পথ হেঁটেছেন বা যাত্রায় থেকেছেন একজন মহিলা সহ সাতজন। এছাড়াও একাধিক নেতাকর্মী আছেন, যাঁদের সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতার কারণে এক-দু'দিন যাত্রা থেকে অব্যহতি নিতে হয়েছে। সমগ্র অধিকার যাত্রাকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে আগামীতে পৃথক একটি দলিল সংগঠন প্রকাশ করবে। এই অধিকার যাত্রার অন্যতম স্থায়ী পদযাত্রী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য **সৌমেন দত্ত** এখানে সমগ্র যাত্রা পথে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।*

কোচবিহারের সিতাই থেকে শুরু হল পথচলা

যে চার দফা দাবিকে ঘিরে এই কর্মসূচী সেই দাবিগুলি সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পক্ষে, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, বেকারদের কর্মসংস্থানের পক্ষে দাবিগুলি

অধিকার যাত্রার ডায়েরি ঃ

প্রথমে ভাবি এই দীর্ঘ ২৩ দিনের যাত্রায় নিয়মিত কর্মচারী আমি কিভাবে ছুটি পাব? পুরোটা সম্পূর্ণ করতে পারবো তো? না যেমন ভাবা তেমন কাজ নয়, পরিকল্পনা করে পরিস্কার ভাবে নিজের ন্যাস্ত দায়িত্ব যতটা সম্ভব অফিসে করে রেখে ন্যায় সম্মতভাবে প্রথমে দশ দিনের অর্জিত ছুটি আবেদন করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি কোনোরকমে অফিস করে সবাই মিলে বিকাল তিনটায় তিস্তা তোর্সা ট্রেনে রওনা দিলাম কোচবিহার জেলার উদ্দেশ্যে। পরদিন ভোর পাঁচটার কিছু আগেই নিউ কোচবিহার স্টেশনে পৌঁছে জেলার ব্যবস্থাপনায় গাড়িতে করে কোচবিহার কর্মচারী ভবন। অবশেষে অল্প বিশ্রাম ও আহার করে সিতাই-এর উদ্দেশ্যে রওনা, জলপাইগুড়ি থেকে আমাদের এই ২৩ দিনের রথ ডব্লিউবি-৭১-৯০৫৬-কে সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদের সহযোগী সাথীরা। সিতাই ব্লকের ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পাশের মাঠে ছোট্ট স্টেজ করা। সেখানে স্থানীয় নেতৃত্বের শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা করা হয় আমাদের 'অধিকার যাত্রার'। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে রক্ত পতাকা ও জাতীয় পতাকা তুলে দেন বর্ষীয়ান কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জি।

● এগারো পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

১৪ মার্চ '২৪—নবান্ন অভিযান

নানাধরনের বাধা অতিক্রম করে যৌথমঞ্চের মিছিল পৌঁছলো নবান্নের দোরগোড়ায়

রাজ্য সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের আহবানে ১৪ মার্চ ২০২৪ নবান্ন অভিযান কর্মসূচী সংগঠিত হয়।

নবান্নের সামনে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য

রাজ্যের শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের অধিকারের দাবি সহ রাজ্যের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের ৪ (চার) দফা হকের দাবির সমর্থনে নবান্ন অভিযান-এর ডাক দেওয়া হয়। ১৪ মার্চ নবান্ন অভিযান-এর পূর্বে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ মার্চ 'অধিকার যাত্রা' সংগঠিত হয় কোচবিহারের সিতাই থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর পর্যন্ত যার সমাপ্তি সভা অনুষ্ঠিত হয় যাদবপুরে ৮বি বাসস্ট্যান্ডে। এর পরবর্তীতে নবান্ন অভিযান সংগঠিত হয় যে দাবিগুলির ভিত্তিতে তা হল— ১। বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, ২। প্রশাসনের সমস্ত শূন্যপদ স্বচ্ছতার সাথে পূরণ করা, ৩। চুক্তিভিত্তিক ও অনিয়মিত সমস্ত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করা, ৪। অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘভাতা ও মহার্ঘ রিলিফ প্রদান করা। এই দাবিগুলির সমর্থনে বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত কর্মচারীদের স্বাক্ষর সম্বলিত সেই দাবিপ্রস্তাব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যসচিবকে প্রদান করার জন্যও সংগঠনের পক্ষ থেকে পত্র প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু ৪ মে ২০২৩-এর যৌথমঞ্চের নবান্ন অভিযান কর্মসূচীর মতোই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কর্মসূচী প্রতিপালনে বাধা সৃষ্টির কারণে

● বারো পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

সাফল্যকে সংহত করে আশু সংগ্রামে সামিল হতে হবে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য কাউন্সিল (ভার্চুয়াল) সভা বিগত ২ এপ্রিল ২০২৩ সন্ধ্যা ছটায় সামাজিক মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করতে গিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সমস্ত জেলা অঞ্চলের কর্মী, নেতা, অনুগামী তথা সাধারণ মানষুকে অভিনন্দন জানান ঐতিহাসিক কর্মসূচী 'অধিকার যাত্রা' সফল করতে সহযোগিতা করার জন্য। সমস্ত অংশের সহযোগিতায় অধিকার যাত্রা সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছে। দীর্ঘ ৩৬০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ২৩ দিন ব্যাপী এই কর্মসূচী অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করেছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত এই কর্মসূচী চলে। ১৭ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার জেলার সন্ত্রাস কবলিত সিতাই ব্লক থেকে এই কর্মসূচী শুরু হয়েছিল। অধিকার যাত্রার কর্মসূচীতে ৩৫০ বা তারও বেশি পদযাত্রা আয়োজিত হয়েছে। ১৫০টা ব্লকের মধ্যে দিয়ে আধিকার যাত্রা গিয়েছে। ৪৬টা পৌরসভাও এই কর্মসূচীর আওতায় ছিল। প্রতিটা জেলা পরিকল্পনা করে বহু মানুষকে এই কর্মসূচীতে নামিয়েছে। কর্মচারীরা ছাড়াও পেনশনার, ছাত্র, যুব, মহিলা এবং ১২ই জুলাই কমিটির আওতায় থাকা অন্যান্য সংগঠনের কর্মীরা এই কর্মসূচীতে ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন জেলায় বিভিন্নভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেছে। তার হিসেব ঠিকমতো রাখতে হবে। অধিকার যাত্রার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয়েছে যে সঠিক পরিকল্পনা করে যদি ময়দানে নামা যায়, তাহলে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছোনো যায়। ১০ মার্চ যাদবপুরে অধিকার যাত্রার শেষ দিনের কর্মসূচীতেও ব্যাপক অংশগ্রহণ হয়েছিল।

অধিকার যাত্রার সাফল্যকে ধারণ করেই কর্মচারী ও জনগণের দাবি নিয়ে যৌথ মঞ্চের আহ্বানে ১৪ মার্চ নবান্ন অভিযান সংগঠিত হয়। প্রশাসন থেকে বারে বারে বাধা এসেছে। সংগঠন আইনি লড়াইয়ে গেছে এবং জয়লাভ করেছে। আদালতের নির্দেশ মেনে মিছিল হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের দীর্ঘ সাত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রশাসন আমাদের সাথে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করেছে। কিছু কর্মচারীর, বিশেষ করে বয়স্ক ও পেনশনারদের শারীরিক অসুবিধে হয়েছে। তবুও প্রায় সকলেই গন্তব্যে পৌঁছোতে পেরেছে। সাড়ে আট হাজার জন অংশগ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে কো-অর্ডিনেশন কমিটির অংশগ্রহণ সাড়ে পাঁচ হাজার। অধিকার যাত্রা চলাকালীন ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচীও প্রতিপালন করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি জেলাতেও এই কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে।

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ—সি এ এ

যেদিন সুপ্রিম কোর্ট ইলেকটোরাল বন্ডকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করল, সেই ১১ মার্চ ২০২৪ কেন্দ্রীয় সরকার দেশজুড়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সি এ এ (সিটিজেনশীপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট) লাগু করার বিজ্ঞপ্তি জারি করল। এই আইন চালু করার সময় নির্বাচনটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত ঐদিনই সুপ্রিম কোর্টে রাজনৈতিক দল সি পি আই এম এবং অন্য একটি সংগঠন এ ডি আর দ্বারা কৃত ইলেকটোরাল বন্ড বাতিল করার মামলাটির রায়ে কোর্ট পরিষ্কার বলে যে ইলেকটোরাল বন্ড সংবিধানের স্বীকৃত নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকারকে লঙ্ঘন করছে। জনগণকে ইলেকটোরাল বন্ডের সমস্ত তথ্য কেন্দ্রকে জানাতে হবে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে। এই রায় ঘোষণার পর মোদি সরকার বিপদে পড়ে যায়। কারণ রামমন্দির, হিন্দুত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে নির্মিত ঘোলাজলে দেশের মূল সমস্যা থেকে জনগণকে সরিয়ে রাখার প্রক্রিয়ায় ইলেকটোরাল বন্ড সংক্রান্ত বিশ্বের বৃহত্তম দুর্নীতির খবর প্রকাশ কেন্দ্রীয় সরকারের মাথায় বজ্রাঘাতের সমতুল। তাই মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেবার জন্য সংবিধানের মৌলিক ভিত্তিকে আঘাতকারী সি এ এ লাগু করার বিজ্ঞপ্তি জারি হল ঐদিন, ১১ মার্চ '২৪।

লোকসভা এবং রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে সি এ এ পাশ হয়েছিল ডিসেম্বর ২০১৯-এ। অর্থাৎ এন ডি এ সরকার দ্বিতীয়বার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হবার প্রায় ছ'মাস পর। তার প্রায় সাড়ে চার বছর পর ঠিক লোকসভা নির্বাচনের মুখে এই আইন কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি করার মধ্য দিয়ে আর এস এস-বিজেপি সংখ্যালঘু বিদ্বেষী রাজনীতির বিষ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে, বাইনারীর মধ্য দিয়ে নির্বাচনে সাফল্য সুনিশ্চিত করতে চায়।

সি এ এ ভারতের সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত। এই আইন শুধু অসাংবিধানিক নয়, সংবিধান বিরোধীও। ডিসেম্বর ২০১৯-এ সংসদে পাশ হবার পর একাধিক সংগঠন সঙ্গত কারণেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়।

আমাদের সংবিধানের অন্যতম মূল মর্মবস্তু হল অখণ্ডতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। যা ভারতীয় নাগরিকদের ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা করে না। অথচ সি এ এ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে বলা আছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে যারা ৩১ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে অমুসলিমদের এই দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশবাসীকে আলাদা করে দেখা আমাদের সংবিধানের মর্মবস্তু বিরোধী। সেইজন্যই ধর্মীয় পক্ষপাতের ভিত্তিতে তৈরি সি এ এ অসাংবিধানিক। আমাদের সংবিধানে ভারতের নাগরিকদের শুধু নয়, ভারতে বসবাসকারী সকলকেই সমানাধিকার দিয়েছে। এই আইন এর উল্টো পথে হেঁটেছে। দ্বিতীয়ত এই আইন আসাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করছে। আসাম চুক্তিতে কাট অফ ডেট ছিল ২৪ মার্চ, ১৯৭১, সি এ এ-তে যেটা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪।

পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে আসা অমুসলিমরা সি এ এ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেলে শ্রীলঙ্কা থেকে আসা তামিল অভিবাসীরা নয় কেন? এরকম অনেক প্রশ্ন ও ধন্দ এই আইনের মধ্যে আছে। ২০১৯ সালে এই আইন পাশ করার উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। তার আগে আগে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদি আর এস এস-র শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ ভাড়া করে সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করে বলেছিলেন যে, "বিক্ষোভকারীদের পোশাক দেখে চিহ্নিত করা যায়"। কোনো দেশের প্রধান এই ধরনের কুরুচিকর কথা বলতে পারেন সেটা এর আগে ভাবা যায়নি। একই সময়কালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, সি এ এ অনুসরণ করেই প্রথমে এন পি আর পরে এন আর সি হবে। এন আর সি করার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে শাহ কোনো রাখঢাক না করেই বলেছিলেন—"The termites will be thrown out"।

তবে সি এ এ, এন আর সি দ্বারা শুধু মুসলিম সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা হচ্ছে সেটা ভাবা ভুল। এর দ্বারা শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নয়, আক্রান্ত হবে আদিবাসী, দলিতদের নানা অংশ, পরিযায়ী শ্রমিকরা, বিভিন্ন যাযাবর গোষ্ঠী এবং মহিলারা ও বিশেষত যাদের নিজেদের নামে জমি নেই।

সি এ এ বিরোধী আন্দোলনের উপর নামিয়ে আনা হয়েছে নৃশংস আক্রমণ। গ্রেপ্তারী, ইউ এ পি এ আইনে মামলা, ইন্টারনেট বন্ধ করে প্রতিবাদকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল মোদি সরকার। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছিলেন, প্রতিবাদীদের গুলি করে মারা উচিৎ।

আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সি এ এ আইনে রাজ্য সরকারের ভূমিকাকে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে। দেশের মধ্যে কেরালায় বাম ও গণতান্ত্রিক সরকারই প্রথম বিধানসভায় সি এ এ বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায়। কেরালা সরকার দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছে, সেই রাজ্যে তারা সি এ এ লাগু করবে না। আর আমাদের রাজ্যের সরকার সি এ এ আইন চালুর পর কার্যত চুপ করে রয়েছে। তৃণমূল সরকারের সুপ্রিমো ২০১৯ সালে লোকসভা, রাজ্যসভায় এই আইন পাশ হবার পর কত তর্জন গর্জন করেছিলেন। আজ কেরালা সরকারের মতো তিনি সাহসী ভূমিকা নিতে পারছেন না কেন? আসলে কেন্দ্রের সরকার, রাজ্যের সরকার উভয়েই ঘোলা জলে মাছ ধরার খেলাতে অভ্যস্ত।

গোটা দেশে সংবিধানের মৌলিক ভিত্তির বিরোধী এই আইনের বিরোধিতায় নেতৃত্বে আছে মূলত বামপন্থীরা। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় অবস্থান দেশবাসী লক্ষ্য করেছেন অতীতে, বর্তমানেও করছেন।

আশু রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম ইস্যু হল দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাবে, না রক্ষা পাবে? নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সি এ এ কেবলমাত্র একটি আইন নয়, এটা ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের উপর একটা চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা দেশকে হিন্দুত্ব রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সি এ এ। চরম সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখতে এই রাজ্যের শাসকদল কখনো নরম সাম্প্রদায়িকতা, কখনোবা প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার সর্বনাশা পথের আশ্রয় নিচ্ছে। আসলে এর মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদী শক্তির ভিত এই রাজ্যে আরও মজবুত করে তোলা হচ্ছে। তাই উভয় বিপদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমাদের। দেশকে বাঁচানো, দেশের সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে রক্ষা করার লক্ষ্য নিয়েই আশু রাজনৈতিক সংগ্রামে আমাদের পরিবার পরিজন সহ যুক্ত হতে হবে। □

৪ এপ্রিল, ২০২৪

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভা

এই সময়কালে বেশ কয়েকটি সমিতির রাজ্য সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সদস্যভুক্তির কাজ চলছে। ২০২৩ সালে আমাদের ৩৮০০০ সদস্য সংখ্যা ছিল। ২০২৪ সালে ৪৫০০০ থেকে ৫০০০০ সদস্যভুক্তির বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করলে ৪৫০০০ সদস্যের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারব। সাধারণ কর্মচারীদের বার্তা দিতে হবে যে আমরাই পারব তাঁদের দাবি আদায় করতে। যারা এখনও বিচ্ছিন্ন আছেন, তাঁদের সংগঠনের পতাকাতলে নিয়ে আসতে হবে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচন আমাদের কাছে একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। আমাদের দেশে আজ গণতন্ত্র ও সংবিধান আক্রান্ত। কর্মচারীদের কাছে ও তাঁদের পরিবারের কাছে বিষয়টিকে নিয়ে প্রচার করতে হবে। কর্মচারী, পেনশনারদের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। ঘরোয়া মিটিং করতে হবে। ১২ই জুলাই কমিটি থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত লিফলেট ও পোস্টার ছাপানো হবে। সংগ্রামী হাতিয়ারও আগামী সপ্তাহে বেরিয়ে যাবে। সেটা দ্রুত জেলায় পৌঁছোতে হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য কর্মচারীদের বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নির্বাচনের কাজে লাগানোর কথা নয়। সংগঠন এই ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু কোনোভাবেই যেন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের কাছে যেন ভুল বার্তা না যায়। তাঁরা যেন এটা না ভাবেন যে সংগঠন তাঁদের চাইছে না।

সংগ্রামী হাতিয়ার প্রকাশ করতে প্রচুর ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এই ভর্তুকি বন্ধ করতে গেলে অন্তত ৫০০০০ গ্রাহক করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে।

এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহক তালিকা দ্রুত দিতে হবে। যারা গত বছর এই তালিকা ও গ্রাহক চাঁদার অর্থ যারা পাঠিয়েছেন, তাঁদের আর নতুন করে অর্থ দিতে হবে না। শুধু তালিকা পাঠিয়ে দিতে হবে। যারা গত বছর কোনোটাই দেননি, তাদের দুটোই দিতে হবে।

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কাউন্সিল সভা আয়োজিত করার জন্য যে ২০ টাকার কুপন সংগ্রহ করা হয়েছিল, তার বকেয়া অর্থ অবিলম্বে জমা দিতে হবে।

পয়লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। প্রতি বছরের মতো এবছরও আমাদের প্রতিপালন করতে হবে। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এই কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণ সম্পাদকের প্রারম্ভিক প্রস্তাবনার পর ২০টি জেলা ও কলকাতার ৫টি অঞ্চল তাঁদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেন। সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়।

গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

□ 'অধিকার যাত্রা' এবং 'নবান্ন অভিযানের' সাফল্যকে সংগঠনের সর্বস্তরে সংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

□ বিশেষ করে 'অধিকার যাত্রা'-র কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জনগণের নানা অংশের সাথে যে মেলবন্ধন ঘটেছে তাকে সাংগঠনিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। যে আস্থা অর্জিত হয়েছে তাকে আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যবহার করতে হবে।

□ আশু রাজনৈতিক সংগ্রামে কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ পরিবার-পরিজন সহ যাতে ইতিবাচক ভূমিকা প্রতিপালন করেন তার জন্য নিবিড় প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ১২ই জুলাই কমিটির পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পেনশনার্স সমিতিকে ব্যবহার করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে।

□ প্রত্যেককে নির্বাচনী কাজে যুক্ত হতে হবে এবং নির্বাচন কর্মী হিসেবে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

□ চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নির্বাচনের কাজে যুক্ত না করার যে সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করেছে তার অন্যথা হলে সাংগঠনিক উদ্যোগ নিতে হবে। একই সাথে একে কেন্দ্র করে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সাথে যাতে আমাদের কোনোরকম দূরত্ব তৈরি না হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

□ আশু রাজনৈতিক সংগ্রামকে কেন্দ্র করে সঠিক সময়ে মুখপত্র প্রকাশ এবং কর্মচারীদের কাছে বণ্টন করতে সাংগঠনিক উদ্যোগ নিতে হবে।

□ ১ মে '২৪ মে দিবসের কর্মসূচী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করতে হবে সর্বস্তরে।

□ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্তদের নিয়ে সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভা এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অঞ্চলগুলির কাউন্সিল সভা অতি দ্রুত অনুষ্ঠিত করতে হবে। প্রতিটি জেলা কাউন্সিল সভা দ্রুত করতে হবে।

□ সদস্যভুক্তির কাজ গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

□ সংগ্রামী হাতিয়ারের নতুন বর্ষে গ্রাহকভুক্তি চলছে। ৫০ হাজার গ্রাহকভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে হবে।

□ এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহকদের তথ্য অতি দ্রুত কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

□ জাতীয় কাউন্সিল উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার চাহিদা দ্রুত কেন্দ্রকে জানাতে হবে।

□ জেলাগুলিতে নির্বাচন সম্পন্ন হলে অরবিন্দ ঘোষ এবং শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর জন্ম শতবর্ষ পালনের কর্মসূচী নিতে হবে। আগামী জুন মাসের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হবে।

□ পরবর্তীতে মৃণাল সেন ও সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষের কর্মসূচী পালিত হবে।

□ আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রচারে পথনাটক বা অন্য কোনো সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর সুযোগ থাকলে তা ব্যবহার করতে হবে। □

সমিতি সম্মেলন

ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্টস এ্যাসোসিয়েশন-এর ২৭তম রাজ্য সম্মেলন উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরে কমরেড মানবকান্তি ঘোষ, কমরেড মৃণাল কান্তি চট্টোপাধ্যায় মঞ্চ এবং কমরেড মানস বিশ্বাস নগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলন উপলক্ষে ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ উত্তর দিনাজপুর জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক কমরেড শম্ভুনাথ চক্রবর্তী নামাঙ্কিত প্রগতিশীল বুকস্টলের উদ্বোধন করেন উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রবীন নেতৃত্ব বিকাশ দে।

বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক তরুণ মজুমদার নামাঙ্কিত সাংস্কৃতিক মঞ্চে 'গেটম্যান' নাটক মঞ্চস্থ করেন রায়গঞ্জ গণনাট্য সংঘ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। ৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ বর্ণাঢ্য রঙিন মিছিল রায়গঞ্জ শহর পরিক্রমার পর রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি লিটন কুমার পান্ডে। শহীদ বেদীতে মাল্যদান কর্মসূচীর পরবর্তী সময়ে ২৭তম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ দাস, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

তৃতীয় সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক বক্তৃতায় আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রবীন নেতৃত্ব ও প্রাক্তন সহ-সম্পাদক প্রবীর মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতন্ত্র রক্ষার্থে শহীদ হয়েছেন মনসুর আলম। তাঁর পরিবারকে সমিতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

রাজ্য সম্মেলনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক স্বপন কুমার মান্ডি। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ মানস সিংহ রায়। খসড়া প্রস্তাববাবলী ও দাবি সনদ পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক জনা মুর্মু সহ অন্যান্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য যথাক্রমে দীপক রায়, নীরদবরণ চ্যাটার্জী প্রমুখ। জেলাগুলি থেকে প্রতিবেদন ও খসড়া প্রস্তাবাবলী, আয়-ব্যয়ের উপর আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ কিস্কু। অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি আশিষ কর এবং অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক শিবাশীষ মজুমদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

২৭তম রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন মহকুমায় প্রাণী স্বাস্থ্য শিবির এবং শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২৭তম রাজ্য সম্মেলন থেকে লিটন কুমার পান্ডে সভাপতি, সহসভাপতি দ্বয় যথাক্রমে শুভাশীষ সাহা এবং নারায়ন চন্দ্র রায়, সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার মান্ডি, যুগ্ম সম্পাদক দ্বয় জনা মুর্মু ও শিবাশীষ মজুমদার এবং কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ সরকার সহ ২১ জনের একটি শক্তিশালী সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। ২৭তম রাজ্য সম্মেলনে লিটন কুমার পান্ডে, দেবব্রত সান্যাল এবং নারায়ণ চন্দ্র রায়কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়েছে। □

গত ২০-২১ জানুয়ারি, ২০২৪ অনুষ্ঠিত হল **পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ড্রাইভার্স ও মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের** ১৯তম রাজ্য সম্মেলন, পূর্ব বর্ধমান জেলার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মচারী ভবনে। শনিবার এক বর্ণাঢ্য মিছিল বর্ধমান শহর পরিক্রমা করার পর সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের আগের দিন একটি প্রগতিশীল বুক স্টলের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রণব আইচ। মোট ৪৬০০ টাকা পুস্তক বিক্রয় হয়।

সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুদীপ্ত সামন্ত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস, ১২ই জুলাই কমিটির নেতা সজল ঘোষ। বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক অর্জুন মান্না। সম্মেলনে প্রতিবেদন পেশ করেন কৃষ্ণকান্ত পাটনী, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ নিরঞ্জন মণ্ডল। ৯টি খসড়া প্রস্তাব পেশ হয়। প্রতিবেদনের উপর ২০ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। জবাবী ভাষণ দেন বিদায়ী রাজ্য সম্পাদক উৎপল রাজবংশী। এদিন সম্মেলন থেকে ৪৪ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত করা হয়। সভাপতি তাপস দাস, সম্পাদক উদয় মল্লিক ও কোষাধ্যক্ষ নিরঞ্জক মণ্ডল নির্বাচিত হয়েছেন। □

সুকান্ত চৌধুরী

আশু রাজনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্ব এবং আমাদের করণীয়

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি)

দেশের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে ১৯ এপ্রিল থেকে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ হল তিনটি রাজ্য যেখানে সাত দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ১ জুন পর্যন্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া চলবে। ৪ জুন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে।

নানা কারণে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। বিগত লোকসভা নির্বাচনগুলির ন্যায় এবারেও নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হবে ঠিকই, কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু বিষয়ের মধ্যেই নির্বাচনী গুরুত্ব সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই নির্বাচনের সাথে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, স্বাধীন বিদেশনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই নির্বাচন ঠিক করে দেবে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় থাকবে কি না। সুতরাং অস্টাদশ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। এই নিরিখে আসন্ন নির্বাচনী সংগ্রামে শ্রমিক-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

সমাজের একজন নাগরিক হিসাবে আমাদের তিনটি পরিচয় রয়েছে। (ক) সব থেকে বড় পরিচয় আমরা ভারতবাসী, ভারতবর্ষের নাগরিক। ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি ভারতীয় নাগরিকদের প্রভাবিত করে চলেছে। তাই ভারতীয় নাগরিক হিসেবে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। (খ) জাতীয় পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাবগুলি রাজ্য পরিস্থিতিকেও প্রভাবিত করে। বিগত প্রায় বারো বছর ধরে চলে আসা তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনে রাজ্যে জীবন, জীবিকা, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আক্রান্ত। এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। এর জন্য ধারাবাহিকভাবে জনগণের সংগ্রাম জারি আছে। সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সন্দেশখালির মা-বোনেদের সম্মিলিত প্রতিরোধ সংগ্রামে নতুন রসদ জুগিয়েছে। আগামী নির্বাচনী সংগ্রামকেও এই সংগ্রামের অংশ করতে হবে। (গ) পেশাগতভাবে আমরা রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে শ্রমিক-কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা নিজেদের চাকরিগত সমস্যা বিশেষত বকেয়া মহার্ঘভাতা, প্রশাসনিক নিয়মনীতি মেনে মর্যাদা নিয়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব রূপায়ন, বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ, অনিয়মিত বা চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সমস্যা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনের ফলাফলের সাথে যুক্ত। অভিজ্ঞতা বলে বামপন্থী জনপ্রতিনিধির সংখ্যা লোকসভার অভ্যন্তরে বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক কর্মচারী তথা শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। সেই নিরিখে উল্লিখিত তিনটি পরিচিতিগত অবস্থান থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামে নির্দিস্ট করতে হবে আমাদের ইতিকর্তব্য।

আসন্ন নির্বাচনী সংগ্রামে অন্যতম প্রধান বিষয় কর্মসংস্থানের সমস্যা। স্মরণে আছে, পূর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি ক্ষমতায় আসলে বছরে দু'কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু বিগত দশ বছরে কুড়ি কোটি বেকারের চাকরি হওয়া দূরের কথা, বিমুদ্রাকরণ, অপরিকল্পিতভাবে জিএসটি চালু করা, রাষ্ট্রায়ত্ব সম্পদ দেশি বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে গত পাঁচ বছরে আমাদের দেশে কর্মরত মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় ৭০ লক্ষ ৩২ হাজার। ২০১৬-১৭ সালে দেশে কর্মরত জনসংখ্যা ছিল ৪১.৩ কোটি। ২০২২-২৩ সালে আমাদের দেশে কর্মরত জনসংখ্যা হল ৪০.৬ কোটি। এই সময়কালে দেশে ১৫ বছর বয়সের উপরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪ কোটি ৭২ লক্ষ। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কর্মরত মানুষের সংখ্যা গত পাঁচ বছরে বিপুল কমে গিয়েছে। এর সাথে লক্ষ্যণীয় গত পাঁচ বছরে দেশের মানুষের শ্রম বাজারে অংশগ্রহণ ক্রমাগত কমে গিয়েছে। দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ মানুষ শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি কর্মক্ষম মানুষ কর্মসংস্থানের আশাই হারিয়ে ফেলেছেন। সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের দেশে গড় বেকারির হার ৪.৭ শতাংশ, যেখানে বিগত দশকগুলিতে গড় বেকারির হার ছিল ২-৩ শতাংশ। বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে, সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির তথ্য অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে বেকারির হার ছিল ৩৪ শতাংশ। ২০২৩-২৪ সালে গড় বেকারির হার বেড়ে হয় ৮.১ শতাংশ।

নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত আর্থিক দুর্নীতি বা কেলেঙ্কারি উন্মোচিত হয়েছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ দুর্নীতি হল নির্বাচনী বন্ড। হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে কর্পোরেট সংস্থার কাছ থেকে টাকা তোলাকে বন্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে তোলাবাজিকে বৈধতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে মোদি সরকার। প্রধানতম কারিগর স্বঘোষিত বিশ্বগুরু নিজে।

নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত যা তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে তাতে মোট সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১৬,৫১৮ কোটি টাকা। যার অর্ধেক পেয়েছে বিজেপি ৮২৫০ কোটি টাকা। তৃণমূলের ভাঁড়ারে ১৭১৭ কোটি। এর মধ্যে ৫২৮ কোটি টাকা মিলেছে ২০২১ বিধানসভা ভোটে জয়ের পরে (সূত্র ঃ আ.বা.প., ১৮ মার্চ, '২৪)। তথ্য থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে দেশের জনগণের অগোচরে কর্পোরেট থেকে যথেচ্ছ পরিমাণে তোলা আদায়ের জন্যই এই নির্বাচনী বন্ড। এটাও লক্ষণীয় যে সব সংস্থার বিরুদ্ধে কর ফাঁকি, অবৈধ লেনদেন, বিদেশে টাকা পাঁচার ইত্যাদি আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ বেশি তারাই বেশি বেশি পরিমাণে শাসকদলের তহবিলে টাকা ঢেলেছে। দেখা যাচ্ছে যেসব সংস্থা মোটা অঙ্কের বন্ড কিনেছে তারা বড় বড় সরকারী প্রকল্পের বরাত পেয়েছে।

এই সরকারের শাসনকালে একদিকে যেমন দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। জনগণের জীবন-যাত্রার উপর নেমে এসেছে সীমাহীন আক্রমণ, তেমনই ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের নেতৃত্বে সংঘ পরিবারের দ্বারা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এবং বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ব্যাপকভাবেই আক্রান্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে প্রথমে ধর্মীয় বিভাজন ঘটিয়ে পরে রাজনৈতিক মেরুকরণ করে নির্বাচনী ফায়দা তোলাই হল প্রধান উদ্দেশ্য।

কর্পোরেট, শিল্পপতি সহ বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া ইলেক্টোরাল বন্ডের বিপুল পরিমাণ টাকার হদিস নির্বাচনের মুখে জনসমক্ষে আসার আতঙ্ক থেকেই খাড়াখাড়ি বিভাজনের উদ্দেশ্যে সিএএ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি জারি। হাস্যকর 'মোদি গ্যারান্টি' বা রাম মন্দিরের ভাবাবেগে যখন চিঁড়ে ভেজেনি, তখন মেরুকরণকে তীব্র করতে ভোটের আবহে মোদি নির্ভর বাইনারি তৈরি করে বিভাজনের রাজনীতিকে উসকে দেওয়ার এ হল মরিয়া চেষ্টা। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ২০১৯ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনেই প্রথম অভিবাসীদের নাগরিকত্বের শর্ত হিসাবে ধর্মীয় পরিচিতিকে যুক্ত করা হয়েছে। ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে এই ধরনের বিভাজন ধর্মনিরপেক্ষতার মূল নীতিকে আঘাত করেছে যা ভারতের সংবিধানের মৌলিক কাঠামো।

সাম্প্রদায়িকতাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যেই আর এস এস অগ্রসর হচ্ছে। এর জন্য দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আর এস এস-এর লোকজনদের বসানো হয়েছে, যাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো জ্ঞানগম্যিই নেই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, দলিত ও জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ এবং মহিলাদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে সংসদীয় গণতন্ত্র বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত। সংসদের অধিবেশনকে হ্রাস করা, রাজ্যসভায় শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিল অর্থবিল আখ্যা দিয়ে রাজ্যসভায় পেশ না করা, বিরোধী দলের সাংসদদের সাসপেন্ড করে একতরফাভাবে বিল পাশ করানো প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সংসদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়া, দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের অধিকার হরণ করার উদ্যোগ নেওয়া। শাসকশ্রেণীর লক্ষ্য হল প্রথমে শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকারহীন কর, তাহলে সাধারণ মানুষকে অধিকারহীন করে তুলতে সমস্যা হবে না। সেই পথেই দেশকে পরিচালনা করছে কেন্দ্র।

দেশে সুদিন আসছে! সুদিনের খোয়াবনামায় মজে দেশের মানুষ বিজেপিকে সরকারে এনেছিল। দশ বছরে বদলেছে অনেক কিছু। সুদিন কাছে আসার বদলে জনগণের জীবনে ঘনিয়ে এসেছে ঘোর দুর্দিন। 'বিশ্ব গুরু' তকমা নিজের গায়ে নিজেই সেঁটেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ভারত পিছিয়েছে ক্ষুধা সূচকে। কৃষি ক্ষেত্রের গভীর সঙ্কট ছায়া ফেলেছে দেশের কৃষকদের জীবনযন্ত্রণায়। অভাবী বিক্রি বাড়তে থাকায় ঋণভারে সারা দেশের কৃষক আজ মহা সঙ্কটের মুখে। কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় আত্মহত্যা, রেকর্ড বেকারত্ব, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করার শিরোপা জুটেছে দেশের মুকুটে। সার্বিকভাবে এই সরকার দেশের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে, কর্পোরেটের পক্ষে। তারই ধারণাতে বুলডোজার গড়িয়ে গেছে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর দিয়ে।

দেশের শিক্ষার সার্বিক বিস্তারের প্রধান অন্তরায়গুলি ছিল উচ্চশিক্ষায় কম অন্তর্ভুক্তির হার, শিক্ষার মানের অধোগমন, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের অসামঞ্জস্য। এই সমস্যার কোনো সমাধানেরই চেষ্টা করা হয়নি জাতীয় শিক্ষানীতিতে। শিক্ষা বর্তমানে মুনাফার উর্বর ক্ষেত্র। তাই সেখানে বেসরকারী সংস্থার অবাধ প্রবেশের সুযোগ দিয়েই শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে গেছে বিজেপি সরকার। আগামী প্রজন্মের বেড়ে ওঠার প্রধান ভিত্তি স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় বাজেট বরাদ্দ কমানো হয়েছে ৫ শতাংশ। উচ্চশিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ কমানো হয়েছে ৯৬০০ কোটি টাকা। যে কারিগরি শিক্ষা শেষ দশকে কর্মসংস্থানের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সেখানে বরাদ্দ ২৫,০০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১৯,৫০০ কোটি টাকা। আগামী প্রজন্মকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করাই এদের আসল উদ্দেশ্য। ফলে একদিকে কমছে শিক্ষায় বরাদ্দ, অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে চলছে ফি বৃদ্ধি। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বছরে বরাদ্দ কমেছে ৮৭ শতাংশ। উল্টোদিকে ফি বৃদ্ধি হয়েছে ৪৬ শতাংশ। শিক্ষায় গৈরিকীকরণের নির্লজ্জ প্রেসক্রিপশন আসছে নতুন শিক্ষানীতি থেকেই। উচ্চশিক্ষায় বাধ্যতামূলক হচ্ছে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামে কিছু পশ্চাদগামী মানসিকতা। বাদ যাচ্ছে মুঘল আমলের কথা, নৌ-বিদ্রোহের কথা, বহুত্ববাদী সংস্কৃতির কথা, ভগৎ সিং-এর বদলে স্থান দেওয়া হচ্ছে সাভারকরকে।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে কেন্দ্রে একটি কর্মচারী বান্ধব সরকার গঠিত হলে তাদের অনেক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের পক্ষে যখন গৃহীত হয়, তার জের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ইতিবাচক দিকে প্রভাবিত করে। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন ছিল আই কে গুজরালের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার। এই সরকারকে বামপন্থীরা বাইরে থেকে সমর্থন জানায়। পঞ্চম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশকে উন্নত করে (সর্বত্র ফিক্সেশন ফর্মুলায় বিশ শতাংশ বুস্টিং-এর পরিবর্তে চল্লিশ শতাংশ) কার্যকর করা হয়েছিল। এর সুফল রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও পেয়েছিল রাজ্য বেতন কমিশনের মাধ্যমে। একই চিত্র ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশের ক্ষেত্রেও হয়েছিল।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায় ভারতবাসী এই মুহূর্তে যে বিষয়ে গভীর উদ্বিগ্ন তা হল, দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, যার ওপর নির্মিত হয়েছে দেশের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার। বস্তুতপক্ষে এগুলি হল ভারতীয় সমাজের চারটি স্তম্ভ, যার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা। আগামী রাজনৈতিক সংগ্রাম তথা দেশ রক্ষার সংগ্রামে সেটা নির্ধারিত হবে।

আসন্ন নির্বাচনী সংগ্রামে রাজ্য পরিস্থিতির প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের একজন ভোটার হিসেবে এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা যায়—(১) রাজ্যের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আক্রান্ত, (২) জীবন-জীবিকা আক্রান্ত, (৩) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আক্রান্ত।

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই রাজ্যে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ শুরু হয়েছে। এই সময়কালে রাজ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে জাল-জুয়াচুরি করে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সর্বশেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে রূপান্তরিত করেছে। জনগণের বিগত বারো বছরের অভিজ্ঞতা হল, রাজ্য নির্বাচন কমিশন, রাজ্য পুলিশ বাহিনী, রাজ্য প্রশাসন সর্বোপরি বর্তমান শাসকদল রাজ্য সরকারে ক্ষমতাসীন থাকলে কোনোভাবেই অবাধ, শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

রাজ্যবাসীর জীবন জীবিকাও এই সময়ে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। রাজ্যের বেকার সমস্যা ভয়াবহ। নতুন কারখানা তো দূরের কথা, চালু বড় কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকারী দপ্তর বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েক লক্ষ্য পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। অধিকাংশ পদেই লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না। যে সামান্য সংখ্যক পদে নিয়োগ হচ্ছে তাও চুক্তিপ্রথায় বা বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই লেনদেনের সাথে শাসকদলের প্রভাবশালী মন্ত্রী থেকে কর্মী যুক্ত। ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে কর্পোরেট পুঁজি নিয়োজিত আর্থিক দুর্নীতি আর দুষ্কৃতির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটছে শাসকদলের আনুকূল্যে।

রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও এখন আক্রান্ত। আক্রান্ত মহিলাদের সম্ভ্রম। বস্তুতপক্ষে রাজ্যে এখন চলছে প্রতিযোগীতামূলক সাম্প্রদায়িকতা। বিজেপির সাথে রাজ্যের শাসকদলের আপসের ফলে গত কয়েক বছরে রাজ্যে আর এস এস-এর শাখা ক্রমবর্ধমান। বিজেপির হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে উসকানি দিচ্ছে তৃণমূল, যাতে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা আরও পুষ্ট হয়। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার আগে আর এস এস'র শাখা ছিল মাত্র ৪৭৫টি। কিন্তু গত ছয় বছরে এই উগ্র সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী সংগঠনটির শাখা পশ্চিমবঙ্গে তিন গুণেরও বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬০০। রাজ্যে আর এস এস পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বর্তমানে ৩০৯টি। এছাড়া ১৬টিতে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশুনা হয়। এর মধ্যে ১৫টি গড়ে উঠেছে গত পাঁচ বছরে। এই তিনশোর বেশি হিন্দুত্ববাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৬ হাজার ৯০০ জন। ৫০০টি শিশু মন্দির ও ৫০টি বিদ্যালয় মন্দির (হাইস্কুল) প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে দ্রুত এগোচ্ছে আর এস এস।

রাজ্যে খাগড়াগড় থেকে বসিরহাট—একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সবক'টি ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বিজেপি-আর এস এস-হিন্দু সংহতি সমিতির সঙ্গে পাল্লা দিয়েই সাম্প্রদায়িক বিভাজনে নেমেছে রাজ্যের শাসকদল। পরস্পরকে পুষ্ট করার লক্ষ্য নিয়েই এই দুই দল এগোচ্ছে। 'রাম নবমী'র মিছিলের পাল্টা 'হনুমান জয়ন্তী' করা তারই একটি উদাহরণ। বিজেপির 'রামমন্দির' নিয়ে দেশজুড়ে প্রচারের পাল্টা তৃণমূল বিভাজনের রাজনীতিকে হাওয়া দিয়ে পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে এই প্রথম 'রামনবমী'র দিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করেছে। এই

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ইলেক্টোরাল বন্ড ঃ কর্পোরেট তোলাবাজির গ্যারান্টি

বিদ্যুৎ দাস

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ‘নির্বাচনী বন্ড’-কে অসাংবিধানিক বলে রায় দেন। অন্য বিচারপতিরা হলেন সঞ্জীব খান্না, বি আর গাভাই, জে বি পারদিওয়ালা, মনোজ মিত্র। বিচারপতিদের সাংবিধানিক বেঞ্চ তাদের রায়ে জানান, নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প ১৯(১)(ক) ধারা লঙ্ঘন করেছে। এই বন্ড প্রকল্প অসাংবিধানিক, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কর্পোরেট অনুদানকারীদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের ১২ এপ্রিল ২০১৯-এর অন্তর্বর্তী নির্দেশের পর থেকে এখনও পর্যন্ত কে বা কোন কর্পোরেট সংস্থা কত টাকা কোন রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দিয়েছে, তা ৬ মার্চের মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক, নির্বাচন কমিশনকে জানাবে এবং নির্বাচন কমিশন তা ১৩ মার্চ-এর মধ্যে প্রকাশ করবে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে অবিলম্বে নির্বাচনী বন্ড বিক্রি বন্ধ করতে হবে এবং যেসব নির্বাচনী বন্ড (১৫ দিনের বৈধতাসম্পন্ন) এখনও রাজনৈতিক দলগুলি ভাঙায়নি, সেগুলি দাতাকে ফেরাতে হবে। বিচারপতিরা আরো জানান যে এস বি আই কে ২ জানুয়ারি, ২০১৮ সালে এই প্রকল্পশুরু হওয়ার পর থেকে নির্বাচনী বন্ড প্রাপ্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশদ বিবরণ, যথা বন্ড ক্রয়ের তারিখ, ক্রেতার নাম, বন্ডের মূল্য, রাজনৈতিক দলের নাম নির্বাচন কমিশনকে জমা দিতে হবে।

গত ৪ মার্চ, এসবিআই নির্বাচনের পর ৩০ জুন সমস্ত তথ্য জমা দেওয়ার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়। আবেদনে জানানো হয় বিভিন্ন সময়ে যেহেতু বন্ড বিক্রি হয়েছে, বন্ডের টাকা কার কাছে জমা পড়েছে এই তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সময় দেওয়া হোক। এই সময় চাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন ওঠে সরকারের মুখ রক্ষায় এসবিআইয়ের মরিয়া প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এই আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট একদিনের মধ্যে সমস্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনকে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়। যারা সুইস ব্যাঙ্ক থেকে কালো টাকা ফেরত বা তথ্য প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারাই স্টেট ব্যাঙ্ককে সুইস ব্যাঙ্ক করার চেষ্টা করেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন অর্থ সচিব সুভাষচন্দ্র গর্গ জানিয়েছেন (যিনি নির্বাচনী বন্ড চালু করার সময় দায়িত্বে ছিলেন) সুপ্রিম কোর্ট যেসব তথ্য চেয়েছে তার জন্য স্টেট বাঙ্কের একদিনের বেশি সময় লাগার কথা নয়। মাউসের এক ক্লিক-ই যথেষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ছয়টি তথ্য জানানোর জন্য আদেশ দিয়েছিল। ১। কে বন্ড কিনেছে? ২। কত তারিখে কিনেছে। ৩। অর্থের অঙ্ক কত? ৪। কোন দল তা পেয়েছে? ৫। কখন তারা সেগুলি ভাঙিয়েছে? এবং ৬। তার পরিমান কত?

তথ্যের অধিকার আইনে (আরটিআই) এক প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক জানিয়েছে নির্বাচনী বন্ডের তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ৬০ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা খরচ করেছে। অথচ ডিজিটাল ব্যাঙ্কিংয়ের অগ্রনী ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক বলছে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য রয়েছে মুম্বাই ব্যাঙ্কের প্রধান শাখায় আলাদা মুখ বন্ধ খামে। জনসাধারণের কাছে স্টেট ব্যাঙ্কের বিশ্বাসযোগ্যতা আজ প্রশ্নের মুখে।

যে দুটি কারণে নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট—১। বন্ডে রাজনৈতিক দলকে স্বেচ্ছায় যে অর্থ দান করছে তা গোপন করা এবং এই কারণে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২৯সি ধারা, কোম্পানি আইনের ১৮৩(৩) ধারা এবং আয়কর আইনের ১৩(এ) বি ধারা সংশোধন করা। এই ধারাগুলি সংশোধন করা হয়েছে সংবিধানের ১৯(১) ধারা লঙ্ঘন করার মধ্যে দিয়ে। যে ধারায় নাগরিককে বাক্ স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ২। কোম্পানি আইনের ১৮২(১) ধারা সংশোধনের মাধ্যমে দেশে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করেছে। কারণ এই ধারা সংশোধনের মধ্যে দিয়ে বিপুল কর্পোরেট অর্থের স্রোত নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের তহবিলে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছে।

আজ থেকে সাত বছর আগে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুন জেটলি তাঁর বাজেট ভাষণে নির্বাচনী বন্ড চালুর প্রস্তাব করেন। মোদি সরকার এই নির্বাচনী তমসুকের পক্ষে যে কুযুক্ত পেশ করেছিল তা হল, নির্বাচনী বন্ডের প্রকল্পটি নির্বাচনকে কালো টাকা এবং অন্যায় চাপ সৃষ্টি বা প্রলোভনের প্রকোপ থেকে রক্ষার কার কাজে সহায়ক হবে। এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতামত জানতে চাইলে, তীব্র আপত্তি জানিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছিল এই বন্ড কাজে লাগিয়ে অস্বচ্ছ এবং অনৈতিক আর্থিক লেনদেন চলার প্রবল আশঙ্কা আছে। কিন্তু সেই আপত্তি উপেক্ষা করে ২০১৮ সালে বন্ড চালু করার সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্রেটিত রিফর্মস (ADR), ‘কমন কজ’ ও সিপিআই(এম)। সেই মামলার ঐতিহাসিক রায়ে নির্বাচনী বন্ডকে ‘অসাংবিধানিক’ ঘোষণা করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ পাঁচ জন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ।

রাজনৈতিক দলগুলোকে চাঁদা বা ঘুষ দেওয়ার আইনি মোড়ক ইলেক্টোরাল বন্ড চালু হওয়ার পূর্বে শিল্পপতিরা যাতে নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতায় আনতে পছন্দের দলকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতে না পারে তার জন্য কিছু বিধিনিষেধ ছিল।

১৯৬০ সালের বিধিতে বলা ছিল কোনো কোম্পানি কোনো রাজনৈতিক দলকে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা বা তার আগের তিন বছরের গড় আয়ের ৫ শতাংশের বেশি অর্থ দিতে পারবে না।

১৯৬৯ সালে সরকার সেই আইনের ২৯৩(এ) ধারা তুলে দিয়ে টাকা দেওয়াকেই বেআইনি ঘোষণা করে। কারণ হিসাবে বলা হয় কোম্পানিগুলো তাদের আর্থিক সুবিধা লাভের জন্যই রাজনৈতিক দলকে অর্থ দেয়। যদিও এর পরেও রাজনৈতিক দলগুলো ঘুরপথে বা বেআইনিভাবে অর্থ পেত। ১৯৮৫ সালে এই বিধিকে আবার ফিরিয়ে আনা হল। শর্ত যোগ করা হল ২০ হাজার টাকার বেশি অনুদান দিলে উভয়পক্ষের নাম ও হিসাব নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। ২০১৪

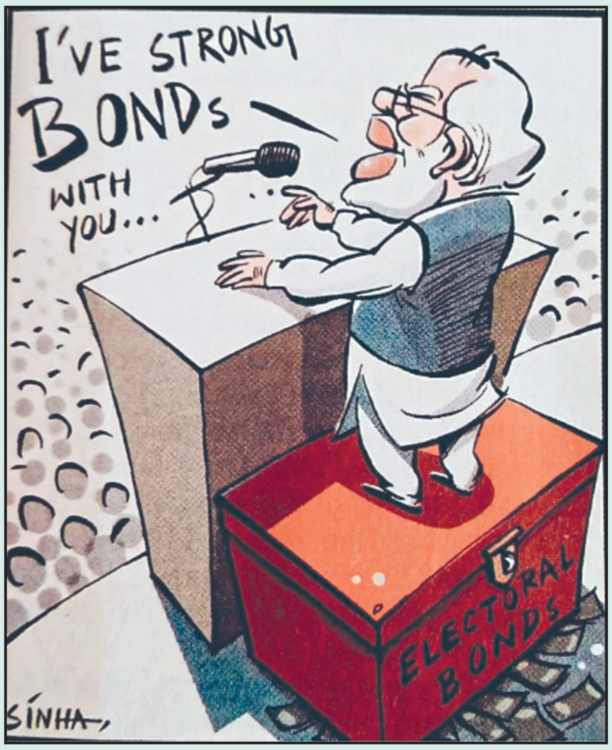

সালে মোদি সরকার অর্থ প্রদানের ঊর্ধ্বসীমা ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭.৫ শতাংশ করে। ২০১৭ সালে ওই ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া হল। কোম্পানিগুলি যত খুশি টাকা দিতে পারবে। ২০১৮ সালে বিদেশী কোম্পানিগুলোর জন্য টাকা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। একই সঙ্গে আনা হল ইলেক্টোরাল বন্ড।

নির্বাচনী বন্ডের মধ্যে দিয়ে দেশে প্লুটোক্রেসির (ধনিক শ্রেণী/ শাসকশ্রেণী) শক্তি বৃদ্ধি পেল। অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা দেশের রাজনীতি, সরকার ও অর্থ ব্যবস্থাকে আরো কুক্ষিগত করা হল। একদিকে যেমন টাটা বিড়লাদের ছাপিয়ে আম্বানি, আদানিরা রকেটের গতিতে সম্পদ বৃদ্ধি করল অন্যদিকে রেগার মজুরি বাড়ছে না, কৃষক এম এস পি পাচ্ছে না, শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি বাড়ছে না, মালিক স্বর্থে শ্রমকোড আনা হয়েছে দেশের সম্পদ জলের দরে সাঙাৎতন্ত্রের হাতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ধনীদের বিপুল কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের গুতোয় এখনও পর্যন্ত যে তথ্য এসবিআই দিতে বাধ্য হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশন তাদের ওয়েভ সাইটে জানিয়েছে তা হল, বিজেপি চাঁদা পেয়েছে ৬০১৬ কোটি টাকা, (৪৬.৪৬%) আঞ্চলিক দল তৃণমূল কংগ্রেস ১৬২০ কোটি টাকা (১২.৬%), কংগ্রেস ১৪২২ কোটি টাকা (১১.১৪%), ভারত রাষ্ট্র সমিতি ১২১৫ কোটি টাকা (৯.৫%), বিজেডি ৭৭৬ কোটি টাকা (৬.০৭%), ডি এম কে ৬১৭ কোটি টাকা (৫.৩৯%), ওয়াই এস আর ৩৮২ কোটি টাকা (৩.৩৪%) প্রমুখ নির্বাচী বন্ড থেকে অর্থ পেয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচিত সরকার ভেঙে হর্স ট্রেডিং করে সরকার গঠন করা স্বঘোষিত ভিখারির বিজ্ঞাপন এবং রাজসিক জীবন যাত্রার জন্য বিপুল ব্যায় সমস্ত ধরনের মিডিয়াকে কিনে নেওয়ার জ্বালানি এখান থেকে সরবরাহ হয়।

বন্ডে বিপুল পরিমান চাঁদা যারা দিয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, লটারি ব্যবসায়ী ফিউচার গেমিং এন্ড হোটেল সার্ভিস-১৩৬৮ কোটি টাকা। এই কোম্পানির মালিক ৮ মাস জেল খেটেছে ৪৫০০ কোটি টাকা প্রতারনা করার জন্য। ইডি, সিবিআই এই কোম্পানির অফিসে রেড করে। নির্বাচনী বন্ড কেনার পর আবার চুটিয়ে লটারির ব্যবসা করছে। ৯৬৬ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে মেঘা ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি। বন্ড কেনার পর ১৪,৪০০ কোটি টাকার বরাত পায়, কুইক সাপ্লাই চেন কোম্পানি চাঁদা দিয়েছে ৪১০ কোটি টাকা, যেখানে তাদের বার্ষিক লাভ ১০৯ কোটি টাকা। বেদান্ত ৮০০ কোটি টাকা, হলদিয়া ৩৭৭ কোটি টাকা, এসেল মাইনিং ২২৪ কোটি টাকা, এয়ারটেল ১৮৩ কোটি টাকা, জিন্দাল স্টিল ১২৩ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে। তথ্যে প্রকাশিত হয়েছে অনেক কোম্পানির নাম, যাদের বাৎসরিক আয়ের থেকে অনেক বেশি টাকার নির্বাচনী বন্ড কিনেছে। কোথায় পেল তারা এই টাকা তার কোনো সদুত্তর নেই। যেমন ফিউচার গেমিং এন্ড হোটেল সার্ভিসের বার্ষিক আয় ২১৫ কোটি টাকা বন্ড কিনেছে ১৩৬৮ কোটি টাকার। এম কে জে এন্টারপ্রাইজের বাৎসরিক আয় ৫৮ কোটি, চাঁদা দিয়েছে ১৯২ কোটি টাকা, মদনলাল লিমিটেডের বার্ষিক আয় ১০ কোটি টাকা কিন্তু চাঁদা দিয়েছে ১৮৩ কোটি টাকা ইত্যাদি।

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া অডিট রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের আয়ের ৯৮ শতাংশই নির্বাচনী বন্ড থেকে এসেছে। ছবি এঁকে, বই বিক্রী করে দল চালাই দাবি করা শাসকদলের প্রধানের দলের ২০২১-২২ আর্থিক বছরের অডিট রিপোর্ট বলছে তৃণমূলের মোট আয় ৫৪৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কর্পোরেট চাঁদা পেয়েছে ৫২৮ কোটি ৫২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। ২০২০-২১ আর্থিক বছরে মোট আয় ছিল ৭৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৭২ টাকা। বিধানসভা ভোটের বছরে তৃণমূল নির্বাচনী বন্ড থেকে পেয়েছে ৪২ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে তৃণমূলের মোট আয় ছিল ৩২৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে পেয়েছে ৩২৫ কোটি টাকা ১০ লক্ষ টাকা (আয়ের ৯৮%)।

প্রকাশিত তথ্য থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে, নির্বাচনী বন্ডে কোম্পানি যত খুশি টাকা রাজনৈতিক দলগুলিকে দিতে পারবে, কোন দলকে কত টাকা দিল তা আর জানাতে হবে না, কোম্পানি অলাভজনক হলেও রাজনৈতিক দলকে টাকা দিতে পারবে, চাঁদা দেওয়ার জন্য কোম্পানিকে তিন বছরের পুরনো হতে হবে তার বাধ্যবাধকতা নেই। রাজনৈতিক দলগুলোকে জানাতে হবে না কার কাছ থেকে কত টাকার বন্ড পেয়েছে। কেন্দ্র বা রাজ্য ক্ষমতায় যারা থাকে তারাই বন্ড থেকে টাকা পেয়েছে। ব্যতিক্রমী বামপন্থী দলগুলো। তথ্যে প্রকাশিত হয়েছে ধনী শিল্পপতিরাই বেশি টাকার বন্ড কিনেছে। যেমন ১ কোটি টাকা মূল্যের বন্ড কেনা হয়েছে ১২৯৯৯টি (৫৪.১৩%), ১০ লাখের বন্ড কেনা হয়েছে ৭৬১৮টি (৩১.৭২%), ১ লাখের বন্ড কেনা হয়েছে ৩০৮৮টি (১২.৬৮%)। অথচ ১০ হাজার টাকার বন্ড কেনা হয়েছে ২০৮টি (০.৮৬%) এবং ১ হাজার টাকার মূল্যের বন্ড কেনা হয়েছে ৯৯টি (০.৪১%), ১ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মোট নির্বাচনী বন্ড বিক্রি হয়েছে ২২,২১৭টি, যার মোট মূল্য ১২,৭৬৯ কোটি টাকা। একই দাতা বার বার দান করেছেন। আবার বড় বড় কোম্পানিগুলি ছোটো, অনামি, অল্পদিনের কোম্পানিগুলিকে শিখন্ড করে বন্ড কিনেছে। যেমন সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কোম্পানিগুলি হল হলদিয়া এনার্জি লিমিটেড, ধারিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, পিসিবিএল লিমিটেড এবং আরপিএসজি ভেঞ্চার্স লিমিটেড। সবমিলিয়ে এই কোম্পানিগুলির মাধ্যমে ৫৪০ কোটি টাকার বন্ড কেনা হয়েছে। নির্বাচনী বন্ডের তালিকায় গোয়েঙ্কা তৃতীয় বৃহত্তম দাতা। তথ্যে প্রকাশিত হয়েছে যে ১৪টি বড় বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি প্রচুর টাকার বন্ড কিনেছে, যার মোট মূল্য ৫৪৩ কোটি টাকা। বন্ড কেনায় বড় ঔষধ কোম্পানির মধ্যে আছে ড. রেড্ডি ল্যাব, টরেন্ট ফার্মাসিটিক্যালস, ন্যাটকো ফার্মা, পিরামল এন্টারপ্রাইজ, সান ফার্মা এন্টারপ্রাইজ, হেটরো ড্রাগস, ম্যানকাইন্ড ফার্মা, অরবিন্দ ফার্মা প্রমুখ। বন্ড কেনার মধ্যে দিয়ে সরকারী বরাত পেয়েছে কোম্পানিগুলি। এই কারণে জীবনদায়ী ঔষধের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় দুর্নীতি ‘কর্পোরেট তোলাবাজি’ নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে ফাঁস হয়ে পড়ায় বনিক সভাগুলি সরকারকে বাঁচাতে এবং বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল, বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচনী বন্ড তথ্য গোপনের আবেদন জানায়। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আদিস আগরওয়াল, বনিক সংগঠন সিআইআই, অ্যাসোচেমের পক্ষে রায় সংশোধনের পক্ষে চড়া মেজাজে সওয়াল করায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় পরিস্কার জানান, “আমাকে ধমকাবেন না। এভাবে বিচার প্রক্রিয়াকে আপনি বাধা দিতে পারেন না”। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতার সোসাল মিডিয়ায় বন্ড তথ্য নিয়ে বিদ্রূপের নিয়ন্ত্রণের আবেদনেরও আমল দেননি প্রধান বিচারপতি। একই সাথে তিনি নির্দেশ দন ২১ মার্চের মধ্যে এসবিআইকে বন্ডের ইউনিক নম্বর সহ যাবতীয় তথ্য নির্বাচন কমিশনকে জমা দিতে হবে। এসবিআই-র আইনজীবী হরিশ সালভেকে বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, এসবিআইয়ের মনোভাব হল, “আপনি বলুন কী করতে হবে আমরা করছি, এই মনোভাব ঠিক নয়, আপনারা বন্ধ করুন, তথ্য যাচাই করে তা প্রকাশ করা, ইউনিক সংখ্যা সহ বন্ডের সমস্ত তথ্যই জমা দিতে হবে”।

প্রকাশিত তথ্য থেকে এটা বেরিয়ে এসেছে যে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কর্পোরেট কোম্পানিগুলিকে গ্যারান্টি বা রাজনৈতিক দুর্নীতিকে বৈধতা দিতে চাওয়া হয়েছিল। আবার একদিকে নির্বাচনী ব্যায়বহুল্য এবং অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাষ্ট্রচালকদের সম্পর্ক—এই দুটি বিষয়ই মোদি সরকারের সময়ে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনী বন্ডের পথ বন্ধ হলেই যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে তা এখনই বলা কঠিন, তার অন্যতম কারণ রাষ্ট্রপোষিত যে বিশ্বায়নী অর্থনীতি দ্রুত গতিতে কার্যকরী করার নানাবিধ কৌশল রয়েছে তার মধ্যেই দুর্নীতি সমার্থক হয়ে যাচ্ছে। যেমন হুমকি দিয়ে কর্পোরেট তোলাবাজির পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন সংবাদে বিচ্ছিন্নভাবে তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে দলের টাকা তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেটদের পিছনে ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তরকে লেলিয়ে দিচ্ছে। দুটি অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে অন্তত ৩০টি কর্পোরেটের পিছনে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে ব্যবহার করে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে কেন্দ্রীয় শাসকদলের তহবিলে মোটা অঙ্কের তোলা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। দলের তহবিলে টাকা আসার পর তদন্ত সংস্থার কাজও শেষ হয়ে গেছে এবং প্রত্যাশিত অনেক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিগুলিকে কার্যত শাসক দলের তোলা আদায়ের যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে।

দুর্নীতির আরও একটি ফান্ড হল ‘পি এম কেয়ার্স ফান্ড’। প্রথমে এই তহবিলকে সরকারি বলা হলেও পরে আরটিআই মাধ্যমে জানা যায় এটি বেসরকারী তহবিল। তাই হিসাব দেওয়া হবে না। অথচ প্রধানমন্ত্রীর পদের সঙ্গে যুক্ত ফান্ডে কারা টাকা দিয়েছেন, কত টাকা জমা পড়েছে তা সরকারের তরফে জানানো হয়নি। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় যে কমপক্ষে ২৩ হাজার ২০৭.৭ কোটি টাকা জমা পড়েছে এই তহবিলে।

● অষ্টম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

ভারতের ইতিহাস বিকৃতি—পেছনের রাজনীতি

প্রণব কর

It is often forgotten that historical interþretataion can be the product of a contemporary ideology—
Romila Thapar

শাসকশ্রেণী চিরকালই তাদের শাসন ও শোষণের বৈধতা অর্জনের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করে। এর জন্য প্রয়োজন হলে তারা ইতিহাসের পুনর্নির্মাণও করে। ভারতের ক্ষেত্রেও এটি একইরকমভাবে সত্যি। বর্তমান সময়ে এই প্রক্রিয়া আরও প্রকটভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে আর এস এস পরিচালিত কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে।

সংঘ পরিবারের ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াসের সূচনা হয় সাভারকারের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। সংঘ পরিবারের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই। সংঘ পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মত হল মুসলিমরা বহিরাগত, বিদেশী, আবার একই সঙ্গে তাদের দাবি হিন্দুরা হল আর্যদের বংশধর। কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য যে আর্যরাও ইরান হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে। ফলে আর্যরাও ভারতে বহিরাগত। তাই সংঘ পরিবারের ইতিহাস চর্চার একটি অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়ায় আর্যরা যে ভারতের আদি বাসিন্দা তা প্রমাণ করা। এইপ্রয়াস যে কী ভয়ানক আকার গ্রহণ করেছে বর্তমান সময়ে, তার কিছু উদাহরণ আমরা রাখবে এই লেখার মধ্যে।

সাভারকার রচিত Essentials of Hudutva প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালে। এইগ্রন্থে তিনি বলেন, যে হাজার হাজার বছর ধরে বৈদিক সভ্যতার সময় থেকেই হিন্দুদের ঐক্য বিরাজমান। এই বক্তব্য, ভারতীয় সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্যের ধারণা তাকে নস্যাৎ করতেই ঘোষণা করা হয়। তিনি বলেন যে সিন্ধু নদের পূর্ব প্রান্তে প্রাচীন ভারতে যে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে সেটাই হিন্দু সভ্যতা নামে পরিচিত হয়েছিল। এইভাবে সিন্ধু সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতার মধ্যে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সাভারকারের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা ছিল হিন্দুদের দেশ ভারতবর্ষের এক গৌরবময় অতীত ছিল। নবম-দশম শতক থেকে বিধর্মী মুসলমান আক্রমণ ভারতে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের সূচনা করেছিল। স্বাভাবিকভাবে এটিই হল সংঘ পরিবারের প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অবস্থান এবং কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি এই ইতিহাস নির্মাণের তীব্র প্রয়াস চালাচ্ছে।

তবে এই বিকৃত ইতিহাস নির্মাণের ইতিহাস আরও কিছুটা পুরনো। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতক থেকে এবং তখন থেকে বিংশ শতক পর্ন্ত এই চর্চার তিনটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়—প্রাচ্যবাদী (Orientalists), উপযোগিতাবাদী (Utilitarians) এবং জাতীয়তাবাদী (Nationalist)।

প্রাচ্যবাদীরা ছিলেন ইউরোপের একদল ঐতিহাসিক যারা তাদের তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং সেই সময় ইউরোপের সমাজে যেসব পরিবর্তনগুলি ঘটছিল, বিশেষ করে যে শিল্পবিপ্লব ঘটছিল তা সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দিহান ছিলেন এবং তার বিপ্রতীপে একটি কল্পরাজ্যের খোঁজ করেছিলেন। এদের মূখ্য প্রতিনিধি ছিলেন জার্মানির বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং ভারতবিদ ম্যাক্সমুলার। এঁরা এই কল্পরাজ্যের খোঁজ পায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার। প্রাচীন বৈদিক যুগের উচ্চ ভারতীয় সভ্যতার প্রশংসা করেন তাঁরা এবং প্রাচীন ভারতের একটি সুখী সমাজচিত্র আঁকেন। পরবর্তীতে এই বক্তব্য গোঁড়া হিন্দুদের অত্যন্ত প্রভাবিত করে। এমনকি বিখ্যাত বর্ণবাদী ফরাসী দার্শনিক এবং নৃতত্ত্ববিদ গোবিনিউ (Gobineau) ভারতের আর্যজাতি এবং জাতিভেদ প্রথার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বর্ণবাদী তত্ত্ব নির্মাণ করেন যার উপর ভিত্তি করেই হিটলারের উত্থান ঘটে।

অপরদিকে উপযোগিতাবাদীরা মনে করতেন যে বৃটিশদের ভারতে আসা একটি দৈব প্রেরিত ব্যাপার। যার মধ্য দিয়ে ভারতের পশ্চাৎপদতা দূর হবে। এদের মধ্যে জেমস মিল ছিলেন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। জেমস মিলের History of British India ভারতের ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা নির্মাণ করে, যার মধ্য দিয়ে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঐতিহাসিক যথার্থ তৈরি করা হয়। তিনিই ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতা এবং ব্রিটিশ সভ্যতা (খৃস্টান সভ্যতা নয়)—এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। ভারতীয় প্রধান প্রধান রাজবংশগুলির ধর্মের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় ইতিহাসের এই ক্রমবিভাগ করেন জেমস মিল। জেমস মিল হিন্দু সংস্কৃতির তীব্র সমালোচক ছিলেন। ফলে প্রাচ্যবাদী এবং জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা তার বিপরীতে হিন্দু সভ্যতাকে আরও গৌরবান্বিত করেন।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা মূলত প্রাচ্যবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন এবং প্রাচীন ভারতের বা হিন্দু ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাই তারা তুলে ধরেছিলেন। জাতীয়তাবাদীদের অন্যতম দুর্বলতা ছিল তারা জেমস মিলের ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় ইতিহাসকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাঙ্গাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেননি।

ভারতীয় সভ্যতার হিন্দু যুগ বলতে সাধারণ ১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বোঝানো হয়। যদিও এই কালপর্বে ভারতে মৌর্য, শক এবং কুষাদের শাসনকাল ছিল সেসব রাজবংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল না। এদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী ৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ভারতীয় সভ্যতার বৌদ্ধ যুগও বলা চলে।

কিন্তু যেটা অদ্ভুত ব্যপার তা হল ১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে হিন্দু যুগের সূচনা বলা হলেও হিন্দু শব্দটির সূচনা অনেক পরে। আরবের লোকেরা হিন্দ্ (India) অঞ্চলের লোকেদের হিন্দু বলে সম্বোধন করত। অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্য থেকে হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি হয়নি, অনেক পরবর্তীকালে বিদেশী আরবদের দ্বারা শব্দটির উৎপত্তি হয়। হিন্দু বলতে আমরা এখন যে ধর্মীয় মানুষদের চিহ্নিত করি তাদের উৎপত্তি শুরু হয়েছে পঞ্চম খ্রীস্টাব্দের গুপ্ত যুগ পরবর্তী সময়ে। তার পূর্বে হিন্দু বলে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতে ছিল না। একইরকমভাবে ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে মুসলিম শব্দটির কোনো প্রচলন ভারতে ছিল না। বরং তাদের যবন (আরব), তুরুস্ক (তুরস্ক) এবং পারসিক (পারস্য) এই নামে অবিহিত করা হত। অর্থাৎ কোনো ধর্মীয় পরিচয় নয় বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ে তাদের সম্বোধন করা হত। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানদের দ্বন্দ্ব বলে ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের কোনো প্রাচীন ভিত্তি নেই, বরং এটির উৎপত্তি একদমই আধুনিক সময়ে, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে।

হিন্দু যুগকে গৌরবান্বিত করতে আর্যদের ভারতের আদি বাসিন্দা বলে প্রমাণের জন্য বিপুল অপচেষ্টা শুরু হয়েছে বেশ কিছু সময় ধরেই। একই সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতার অঙ্গ তা প্রমাণের জন্যও বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রতারণারও অবতারণা করা হচ্ছে। আমরা জানি সিন্ধু সভ্যতা ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিকাশ লাভ করেছিল এবং আর্য সভ্যতা ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বিকাশ লাভ করেছিল। সিন্ধু সভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। দুই সভ্যতার পার্থক্য বোঝাতে যে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণটি ব্যবহার করা হয় তা হল সিন্ধু সভ্যতা ঘোড়ার ব্যবহার জানত না এবং আর্য সভ্যতা ঘোড়ার ব্যবহার জানত। সিন্ধু সভ্যতা যে আর্য সভ্যতারই অংশ তা বোঝাতে একটি প্রতারণামূলক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ২০০০ সালের কিছু আগে থেকেই। এন এন জয়রাম এবং ডঃ নটবর ঝা—এই দুজনে মিলে ১৯৯৯ সালে The Deciphered Indus Script নামক বইয়ে দাবি করেন যে তারা সিন্ধু উপত্যকার বিভিন্ন প্রাচীন সিল পরীক্ষা করে তার মধ্য থেকে ঘোড়ার ছবি যুক্ত সিল খুঁজে পেয়েছেন। একই সঙ্গে তারা দাবি করেন যে তারা সিন্ধু সভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধারও করেছেন। সারা বিশ্বজুড়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন পরে যায় এই দাবি নিয়ে। জয়রাম দাবি করেন যে ঘোড়ার ছবিযুক্ত সিল প্রমাণ করে যে সিন্ধু সভ্যতায় ঘোড়ার ব্যবহার ছিল। তিনি আরও বলেন যে এই সিলগুলির তলায় অশ্ব শব্দটি লেখা আছে। তিনি জানান যে সিন্ধু লিপি হল 'Late Vedic' Sanskrit। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেল যে পুরোটাই মিথ্যা প্রচার। সিন্ধু সভ্যতায় বিভিন্ন যে সিলগুলি ব্যবহৃত হত তাতে একশৃঙ্গ বিশিষ্ট ষাঁড়ের ছবি থাকতো। এরকম একটি সিল এমনভাবে ভাঙে যে তার শৃঙ্গটি নষ্ট হয়ে যায়। সেই ষাঁড়ের ছবিটিকে জয়রাম অশ্বের ছবি বলে চালিয়ে দেন। একইভাবে সিন্ধু লিপিকে 'Late Vedic' বলাটাও একটা ধাপ্পাবাজি। এভাবে ধাপ্পাবাজির মাধ্যমে হিন্দু সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতার অন্তর্গত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

ঠিক একইরকম একটি মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে। সংঘ পরিবারের দাবি ভারতে গোমাংস ভক্ষণের প্রথা চালু হয় মধ্যযুগে মুসলিম শাসনকালে। ঐতিহাসিক ডি এন ঝা তার দুটি বইয়ে Holy Cow : Beaf in Indian Dietary traditions (2002) এবং The Myth of the Holy Cow (2009)—এ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে পুরো প্রচারটাই মিথ্যাশ্রিত। তিনি ঋকবেদ থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখান যে বৈদিক দেবতা এবং ঋষিরা গো-মাংস ভক্ষণ করতেন। ইন্দ্র ষাঁড় এবং মোষের মাংস অত্যন্ত পছন্দ করতেন। অগ্নিদেবতা ষাঁড় এবং গরুর মাংস পছন্দ করতেন। ঋষি মিথিলা এবং যজ্ঞবল্কও গো-মাংস পছন্দ করতেন। ডিএন ঝা ঋকবেদ থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখান যে অগ্নিদেবতার বর্ণনায় বলা হয়েছে যে তিনি হলেন "এমন একজন দেবতা যার খাদ্য হল ষাঁড় এবং পরিত্যক্ত গরু' [Vol. 43.11]। তৎকালীন সময়ে বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানেও গরুর মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল। অথচ আজকের দিনে সংঘের নেতৃত্বে দিকে দিকে গো-রক্ষা বাহিনী গড়ে তুলে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, এমনকি হত্যাও করা হচ্ছে এই মিথ্যা ধারণার উপর ভিত্তি করে যে হিন্দুরা চিরকালই গরুকে পুজো করত এবং মুসলমানরাই গোমাংস ভক্ষণ করে।

একইরকমভাবে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিকে ইতিহাস বলে দাবি করে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিরা রাজনৈতিক মেরুকরণের মাধ্যমে ভোটের সুবিধা লাভ করতে চাইছে। ২০০৭ সালে ইউ পি এ সরকারের আমলে 'সেতুসমুদ্রম শিপ চ্যানেল প্রোজেক্ট (SSCP)' নামক প্রকল্পটি রূপায়নে সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের মধ্যে সংযোগকারী ১৬৭ কিমি লম্বা একটি প্রণালী (Channel) খননের সিদ্ধান্ত হয় ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী সামুদ্রিক অঞ্চল। সেই সামুদ্রিক অঞ্চলের তলদেশ দিয়েই পৌরাণিক রামসেতু রয়েছে—এই দাবি তুলে বিজেপি প্রকল্পটি বাতিলের দাবিতে কোর্টে মামলা করে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলে। সংঘ পরিবার দাবি করে যে রামসেতু ১৭.৫ লক্ষ বছর আগে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন।

এটা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটে ২ লক্ষ বছর আগে এবং এশিয়া অঞ্চলে ১ লক্ষ বছর আগে মানুষের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত যে রাম সেতু বলে যা পরিচিত তা মানুষ নির্মিত কোনো সেতু নয়, এটি একটি প্রবাল প্রাচীর, যার বয়স ১,২৫,০০০ বছর। পুরাণকে সংঘ পরিবারের ইতিহাস বলে চালাবার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া সুপ্রিম কোর্ট এইসব বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে এফিডাভিড দাখিল করে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যাতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়, তা মাথায় রেখেই মনমোহন সিং-এর সরকার এই এফিডাভিট তুলে নেয়। এভাবেই রাজনৈতিক সুবিধলাভের ধান্দায় পৌরাণিক কাহিনীকে ইতিহাস বলে চালানোর অপচেষ্টা সংঘ পরিবার বারে বারে করেছে এবং সংঘ বিরোধী শক্তিদের এক বড় অংশ বিভিন্ন সময়ে তাদের কাছে আত্মসমর্থন করেছেন।

একইভাবে হিন্দুত্ববাদীরা প্রাচীন ভারতের গুপ্ত যুগএক 'সুবর্ণ যুগ' বলে অবিহিত করে হিন্দু শাসনের মহিমা প্রদর্শন করেন। কিন্তু রোমিলা থাপার বা দ্বিজেন্দ্র নারায়ন ঝা—এদের মতো ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারতে কোনো 'সুবর্ণ যুগ'-এর অস্তিত্ব ছিল না। আসলে ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা ছিল রাজবংশকেন্দ্রিক ইতিহাস রচনা। নির্দিষ্ট কোনো রাজবংশের আমলে রাজদরবারের কাহিনী, সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইত্যাদিই লেখা হত সেই ইতিহাসে। কিন্তু সেই সময়কার অর্থনৈতিক ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস লেখা হত না। পরবর্তীকালে রোমিলা থাপার, ডি.এন রায়েরা গুপ্তযুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে গুপ্তযুগেও সাধারণ মানুষ অসাম্য, শোষণ, ধর্মীয় হানাহানির শিকার হয়েছেন অন্যসব আমলের মতোই। ফলে আদপেই কোনো 'সুবর্ণযুগ' প্রাচীন ভারতে ছিল না। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কারণেই এই ইতিহাস বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।

মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস প্রসঙ্গে আবার বিপরীত ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। প্রাচীন যুগকে যেমন গৌরবান্বিত করার চেষ্টা দেখা যায়, মধ্যযুগকে তেমন আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাবার উদগ্র প্রবণতা দেখা যায়। আসলে জেমস মিল ভারতের ইতিহাসকে যেভাবে হিন্দু, মুসলিম সভ্যতায় ভাগ করেছেন তার থেকেই এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। সংঘ পরিবার তাদের মুসলমান বিদ্বেষী অবস্থান থেকে মধ্যযুগকে মুসলমান শাসকদের দ্বারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার, তাদের ধর্মস্থান ধ্বংস, ধর্ম পরিবর্তনের জন্য বলপ্রয়োগের ইতিহাস বলে প্রচার করেন। প্রাচীন যুগে যেমন হিন্দু রাজত্ব বাদেও একটা বড় সময় বৌদ্ধ রাজত্ব ছিল, তেমন মধ্যযুগেও ইসলাম শাসনের পাশাপাশি হিন্দু রাজত্বও ছিল। আসলে রাজবংশ বা শাসকবর্গের ধর্ম দেখে ইতিহাসের এক একটি পর্বকে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত ইতিহাস বলে ঘোষণা করাটাই একটি অনৈতিহাসিক প্রবণতা। ইতিহাসকে জানতে গেলে একটা পর্ব থেকে আরেকটা পর্বে সমাজের মধ্যে কী পরিবর্তন ঘটছে, তার উৎপাদন ব্যবস্থায় কী পরিবর্তন ঘটছে এবং তাকে কেন্দ্র করে সমাজ সংগঠনের মধ্যে কী পরিবর্তন ঘটছে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে হবে। শুধু রাজবংশের এবং রাজদরবারের ঘটনাক্রমের মধ্যে আটকে থাকলে তা প্রকৃত ইতিহাস হয়ে ওঠেনা।

আরব, তুরস্ক, পারসীক—এই সমস্ত শাসকদের একসঙ্গে মুসলমান শাসক বলে পরবর্তীকালে এক বন্ধনীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এদেরকে কোনো ধর্মীয় পরিচয়ে ভূষিত করা হত না, মূলত তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ে আখ্যায়িত করা হত। যেমন আরবদের বলা হত যবন। যবন বলতে পশ্চিম এশিয়া এবং ভূ-মধ্যসাগর অঞ্চল থেকে আগত গ্রীক, রোমান বা আরবীয় যে কোনো ধরনের মানুষজনকে বোঝানো হত। আবার তুরস্ক, পারস্য বা আরব থেকে আগত মানুষদেরকে ম্লেচ্ছ বলেও সম্বোধন করা হত। ম্লেচ্ছ বলতে সাধারণত সেইসব মানুষদের বোঝানো হত যারা অনার্য ভাষায় কথা বলত এবং সেজন্য আর্য সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো পরিচিতি ছল না। অর্থাৎ ম্লেচ্ছ শব্দটি কোনো ধর্মীয় পরিচয় বহন করে না, বরং একটি সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। পরবর্তীতে ম্লেচ্ছ বলতে সাধারণ বিদেশীদেরই বোঝানো হত। 'হিন্দু' শব্দের বিপ্রতীপে 'মুসলমান' শব্দটির বহুল প্রচলন শুরু হয় ত্রয়োদশ শতক থেকে।

মধ্যযুগে মুসলমান শাসকেরা গোঁড়া ইসলাম ধর্মের নিয়ম কানুন দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন বলে বক্তব্য হাজির করা হয়। কিন্তু তৎকালীন শাসকদের শাসনকার্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ধর্মীয় শাসন নন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই সুলতানি শাসন পরিচালিত হত। সুলতানি যুগে রাজদরবারের অন্তর্গত অভিজাতবর্গ মুসলীম ধর্মাবলম্বী হলেও রাজা, রাও, রাম, জমিদার ইত্যাদির নিয়ে যে বৃহত্তর শাসক শ্রেণী ছিল তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। শাসকদলের মধ্যে এই বিভিন্ন ধর্মীয় অংশের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব ছিল। এইসব দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতিতে জিয়াউদ্দীন বারণির মতো ঐতিহাসিকেরা চেয়েছেন শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত হিন্দুদের বিনাশ করে দিতে। কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই বক্তব্যের কোনো প্রভাবই ছিল না। কারণ হিন্দু সম্প্রদায়কে বিনাশ করতে হলে ভারতের কৃষক সম্প্রদায়কেও বিনাশ করতে হত, যে কৃষক সম্প্রদায়ই খাজনা দিয়ে, উদ্বৃত্ত শ্রম দিয়ে অভিজাতদের বিলাস বসনের ব্যবস্থা করত। ফলে তৎকালীন আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির দিকে মনোযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে মধ্যযুগের ভারতবর্ষের দ্বন্দ্ব বলে হিন্দুত্ববাদী ঐতিহাসিকেরা প্রচার করে চলেছেন।

আলাউদ্দীন খিলজিকে যেমন হিন্দুত্ববাদীরা একজন হিন্দুবিদ্বেষী, ধর্মান্ধ শাসক বলে চিহ্নিত করে। কিন্তু আলাউদ্দীন খিলজি

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

যে কোনো মূল্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা কর

শাশ্বতী মজুমদার

অযোধ্যায় রামমন্দির অসমাপ্ত অবস্থাতেই তড়িঘড়ি উদ্বোধন করা হল। ২০২৪ সালে অষ্টাদশ লোকসভার নির্বাচন ঘোষণার ঠিক আগেই। ২২ জানুয়ারি, ২০২৪। এতে সরকারী কোষাগার থেকে খরচ হয়েছে ১৮০০ কোটি টাকা। রাম লালার 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, পাশে আরএসএস সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন—রামমন্দির কোনো সাধারণ মন্দির নয়, এটি জাতীয় মন্দির। রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক বিবেকের ঐক্যবদ্ধ প্রকাশ, সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সূচনা। অশ্রুতপূর্ব এই 'সাংস্কৃতিক বিবেক', 'সাংস্কৃতিক নব জাগরণ'-এর ডিসটোপিয়া কল্পনা করে আতঙ্কে শিহরিত হবারই কথা। বাস্তবের যে ভারতে দেশবাসীকে এখন নিত্যদিন বসবাস করতে হয় সেখানে ভাষিক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু, নিম্নবর্গীয়, দলিত, নারীদের ওপর আক্রমণ নৈমিত্তিক ঘটনা। যেখানে প্রতিবাদীদের জন্য রয়েছে দেশদ্রোহিতার তকমা, ইউএপিএ-র খাঁড়া—মুহুর্মুহু ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। আসলে ২২ জানুয়ারি ভারতের রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্টরা ৩২ বছর বাদে চক্রান্তের একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করছে। তাই তারা উল্লসিত।

ঐ বৃত্ত শুরু হয়েছিল ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর। সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে সংগঠিত হিন্দুত্ববাদী শক্তির কয়েক হাজার কর সেবক যখন রামজন্মভূমির নামে গভীর ষড়যন্ত্রকে সফল করে তুলল, তখন ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন বাবরি মসজিদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ভাবমূর্তিও ধুলোয় মিশে গেছিল। সেই অসহনীয় দৃশ্য শুধু সাধারণ ভারতবাসীদেরই নয়, গোটা পৃথিবীকেই স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। তারপরে কয়েক মাস ধরে প্রায় সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ভয়াবহ দাঙ্গা হতে থাকে, দু'হাজারের ওপর মানুষের মৃত্যু হয়। দেশের সর্বাধুনিক বাণিজ্য শহর মুম্বাইতে ৮০০-র বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়। তাঁদের বেশির ভাগ ছিলেন ধারাভির মতো শহরের কুখ্যাত বস্তিগুলোর গরীব মানুষ, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই। যদিও সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ভাগ ছিল অনেকগুণ বেশি। ১৯৪৮ সালে ৩০ জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর এতো বড় আঘাত আর আসেনি।

তখনও পর্যন্ত হিন্দুত্ববাদী আরএসএস পরিচালিত রাজনৈতিক দল বিজেপি কেন্দ্রের শাসনক্ষমতা দখলের থেকে দূরে, যদিও তারা সেসময়ে সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল এবং উত্তর ভারতের তিনটি প্রদেশে—মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশে সরকার পরিচালনা করছে। এই শক্তি নির্বাচনে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পেয়ে কেন্দ্রের সরকারে যদি আসে তাহলে কী ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ভারত রাষ্ট্র তার সংখ্যালঘু নাগরিকদের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দিতে ব্যর্থ কিনা এর আগে কখনও এই প্রশ্ন এত জোরালো ভাবে উত্থাপিত হয়নি। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে আর একটি বিপদের কথা--- ভারতের সংবিধান প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বনাম আরএসএসের হিন্দুরাষ্ট্র প্রকল্প।

তৃতীয় যে বিষয়টি অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত কিন্তু গভীর তাৎপর্যময়, তা'হল—১৯৯১ সালে নব্য উদারনীতি চালু হওয়ার পর থেকেই তার বিরুদ্ধে লড়াইতে ভারতের শ্রমজীবি মানুষের যে ব্যাপক ঐক্য গড়ে উঠছিল তাকে বিভাজিত করার চেষ্টা প্রথম থেকেই করেছে হিন্দুত্ববাদীরা।

গত তিন দশক ধরে দেশের রাজনীতির দৃশ্যপট পাল্টেছে বহুবার। হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট আরএসএসের পরিচালিত রাজনৈতিক দলটি ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্বে মোদীর নেতৃত্বে তাদের স্বরূপ দেখিয়েছে, ১৯৯৮-২০০৪ সাল অবধি সরকারে থাকার সময়ে যে মুখোশ তারা রেখেছিল, বর্তমান পর্বে তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে ২০১৯ সালে সপ্তদশ নির্বাচনের আগে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের হাতিয়ার হিসাবে রাম মন্দির নির্মাণ, সিএএ, ৩৭০ ধারা বাতিলের মতো বিষয়গুলিকে ইস্তেহারে তারা স্থান দিয়েছিল। সপ্তদশ লোকসভার মেয়াদ ফুরোনোর আগে তাদের মধ্যে এক অভিন্ন দেওয়ানী বিধি ছাড়া বাকি সবকটির প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। শুধু কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা, কালো টাকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীদের ক্ষমতায়ন ইত্যাদি মানুষের বাস্তব সমস্যা নিরসনের প্রতিশ্রুতিগুলিই শুধু ইস্তেহারের পাতাতে পড়ে আছে।

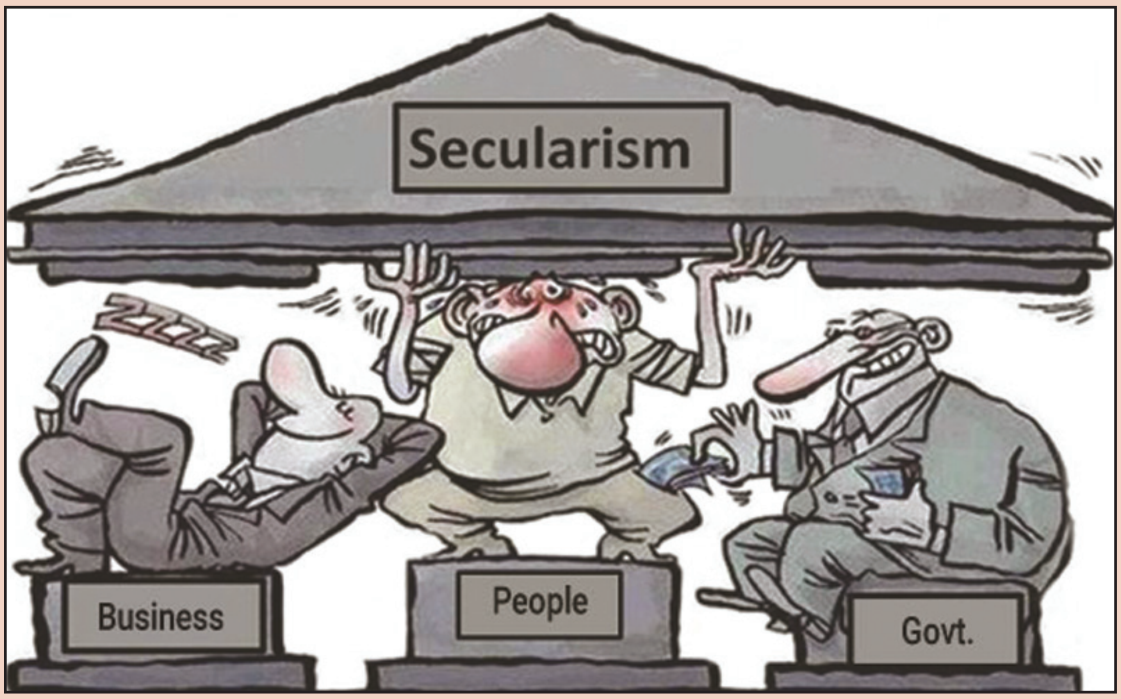

সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল

২০১৯ সালে মোদী সরকার একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বার ফিরে আসার পর আর অপেক্ষা করেনি। ৫ আগস্ট, ২০১৯-এ সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে কেড়ে নেওয়া হল জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটি ভেঙে জম্মু এবং কাশ্মীর ও লাদাখ এই দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হল। রাজ্য বিধানসভাকে অন্ধকারে রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তারপর প্রতিবাদের পথ রুদ্ধ করা হল। দুজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ ৪০০০-এর বেশি মানুষ গ্রেপ্তার হলেন। গোটা কাশ্মীর উপত্যকা যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তরীণ হল। মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরকে শায়েস্তা করার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করা ছাড়া, তাদের সম্বন্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়া এর আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। ৯০ দশকে জেকেএলএফ জঙ্গিদের হাতে আক্রান্ত, ঘরছাড়া যে কাশ্মীরী পন্ডিতদের জন্য অনেক কুমিরের কান্না কাঁদা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বিতর্কিত 'কাশ্মীর ফাইলস' ফিল্মটি দেখার জন্য সবাইকে আহ্বান করেছিলেন। তাদের পুনর্বাসন কিন্তু একবিন্দুও হয়নি পাঁচ বছর পরও। তাঁরা বলছেন, শেষ পুনর্বাসন হয়েছিল ইউপিএ সরকারের সময়ে।আজ লাদাখও ষষ্ঠ তপশিলের জন্য আন্দোলন করছে।

বাবরি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়

৯ নভেম্বর, ২০১৯-এ বাবরি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় হল—বিতর্কিত জমিতে রামমন্দির তৈরির জন্য ৩ মাসের মধ্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করে সরকার তাকে দায়িত্ব দেবে, অন্য জায়গায় মসজিদ তৈরির জন্য জমি দেওয়া হবে। যদিও বলা হল বাবরি মসজিদ ভাঙা আইনবিরুদ্ধ কাজ হয়েছে। (লক্ষণীয়, সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু রামমন্দির প্রতিষ্ঠা সরকারকে করতে বলেনি।পদে পদে দেশের সংবিধান ,আইন, বিচারব্যবস্থা সবকিছুকে এরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে।)

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায় তো গেল স্বয়ং 'রাম লালা বিরাজমান'-এর পক্ষে। কিন্তু শিশু ভগবানের হয়ে মামলা লড়লেন কারা? রাম লালার অভিভাবক এবং বন্ধু বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা! কেউ বলল না এদেশে শিশু কৃষ্ণ বা বাল গোপালের পুজোর রেওয়াজ থাকলেও ভু-ভারতে কোথাও শিশু বা বালক রামের পুজোর রেওয়াজ নেই। রাম লালা নামেই কেউ শোনেনি। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত কোথাও নেই। তুলসিদাসের রামায়ণে একটি মাত্র পদে বরবেশি রামকে রাম লালা বলা হয়েছে, শিশু রামকে নয়। 'রাম লালা বিরাজমান' ঐতিহাসিক চরিত্র তো নয়ই,মহাকাব্যিকও চরিত্রও নয়, বিগত ৪০-৪৫ বছর ধরে ভিএইচপি মিথ্যা দিয়ে তাকে গড়ে তুলেছে।

সিএএ-এনপিআর-এনআরসি

১১ ও ১২ ডিসেম্বর, ২০১৯-এ নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন পাশ করানো হল। লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। নাগরিকত্বের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয়কে যুক্ত করার চেষ্টা কেন? একমাত্র কারণ মুসলিমদের বাদ দেওয়া। সিএএ-এনআরসি- এনপিআর বিরোধী আন্দোলন শুরু হল। সারা দেশে এই আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠলেন মহিলারা, ছাত্র ও তরুণরা। নির্বিচারে পুলিশি অত্যাচার শুরু হল, মুসলিমদের ওপর অভাবনীয় আক্রমণ চলল। প্রবল চাপের মুখে যখন সরকার, তখন তারা সাময়িক চুপ করে গেল। কিন্তু কিছুদিন আগে সিটিজেন ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস সংস্থা প্রকাশ করেছে, ঘুরপথে আধার ডেটাবেসকে জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জীর (এনপিআর) ডেটাবেসের সঙ্গে অনেক আগেই লিংক করা হয়েছে। জনগণনার মতো পদ্ধতিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অবহিত সম্মতি সংগ্রহ না করেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ২০২০-২১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন রামমন্দির উদ্বোধন করার কয়েকদিনের মধ্যেই উন্মাদনার জোয়ার থাকতে থাকতেই ১১ মার্চ, ২০২৪ নাগরিকত্ব আইন প্রয়োগের বিধি চালু করে দেওয়া হল। শিকাগোর 'জাস্টিস ফর অল' সিএএ-কে দ্য থার্ড রাইখ সিটিজেনশিপ ল'র সঙ্গে তুলনা করেছে। এই আইন ১৯৩৫ সালে জার্মানিতে ইহুদী বিতাড়নের জন্য করা হয়েছিল। 'দ্য হিন্দু'তে প্রকাশিত খবর—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হেল্পলাইন থেকে জানানো হচ্ছে, সিএএ-র জন্য আবেদন করতে গেলে স্থানীয় কোনো পুরোহিত সার্টিফিকেট দিলেই হবে। পাকিস্তানের কিছু হিন্দু বলেছেন তাঁরা দিল্লির একটি অঞ্চলের আর্য সমাজ এবং শিবমন্দির থেকে সার্টিফিকেট নিয়েছেন।

হিন্দুধর্মের বিকৃত নির্মাণ

হিন্দুত্বের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। হিন্দুত্ব সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। সকলেই জানে হিন্দুধর্মের কোনো সংগঠিত কাঠামো নেই। যে ধর্মের ভেতর নানা ধারার, নানা দর্শনের, নানা ধর্মাচরণে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীরা রয়েছেন, বহু বিশ্বাস এমনকি পরস্পরবিরোধী, পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী, যে ধর্মে রামকে যেমন কেউ কেউ পুজো করেন, তেমন রামের শত্রু রাবণও তো কোথাও কোথাও পূজিত হন! যে ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান নেই, নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ নেই তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের স্বার্থে বেশি দূর ব্যবহার করা যায় না। সঙ্ঘপরিবারের রাজনৈতিক প্রকল্প হাসিল করতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটারদের আনুগত্য আদায় করাই যথেষ্ট নয় তাকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে গেলে উগ্র সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী প্রচার দরকার। যে পরিবেশে অ-হিন্দুদের প্রতি কল্পিত শত্রুতার বোধ থেকে সবসময়েই পেশী আস্ফালন এক ধরণের সামাজিক মান্যতা পেয়ে যায়। শুধু অহিন্দু নয়, হিন্দুদের ভিতরেও নিম্নবর্ণের প্রতি যাতে 'ভিন্ন' বোধ, ঘৃণার বোধ তৈরি হয়। সেজন্যই রামের নামে 'জাতীয় মন্দির' তৈরি করা হয়।

উগ্র জাতীয়তাবাদ দীর্ঘদিন কাজ করতে পারে না সমাজে যদি সমাজে যুক্তিবাদের প্রসার হয়, বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসের চর্চা হয়। ফ্যাসিস্টদের বিকৃত ক্রিয়াকলাপ জারি রাখার জন্য দরকার হয় অন্ধ আনুগত্য। তাই তারা সমাজের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কারের কবলে পড়ে থাকা মানুষকে টার্গেট করে তাকে যুক্তিহীনতা, অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞানের প্রসার, ইতিহাসের বিকৃতির পথ ধরে উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে আকর্ষণ করে। হিন্দু ধর্মের উদারতা, সহিষ্ণুতা, সমন্বয়ের শিক্ষার বদলে হিন্দু ধর্মের বর্জনমূলক, হিংস্র এক রূপকে হাজির করছে তারা এই লক্ষ্যেই।

সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা

সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি কেউ নিজের মনগড়া ধারণায় বসিয়ে দেয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সভ্যতা যেভাবে গড়ে উঠেছে নানা সভ্যতার সমন্বয়ে, সেই সংমিশ্রণের ইতিহাসকে মান্যতা দিয়ে সংবিধানে ওতোপ্রোত হয়ে আছে বহুত্বের ধারণা, যার অংশ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাও। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রকে আলাদা করা যায় না।

আমাদের সংবিধান এমন এক গণতন্ত্রের কথা বলে, যেখানে ধর্মীয় পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয়, জাতপাতের পরিচয়, ভাষার পরিচয় কোনো কিছুর নিরিখেই বৈষম্য করা চলে না। সবার কাছে সমান সুযোগ পৌঁছানোর নামই গণতন্ত্র। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব থাকলে এই কারণেই তা অগণতান্ত্রিক হতেও বাধ্য।

ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা এসেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যের চেতনার হাত ধরে, পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে, দেশভাগের যন্ত্রণা থেকে। ১৯৪৮ -৫০ সালে গণ পরিষদের বিতর্কগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায়, ধর্মনিপেক্ষতার প্রসঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের সময় শুধু ধর্মাচারণের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেই নয়, অন্য বিভিন্ন বিষয়ের বিতর্কের মধ্যেও আলোচিত হয়েছে। সংখ্যালঘুর অধিকার, সরকার পোষিত সংস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে কিনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে। সংবিধানের ১৫, ১৬, ২৫ ,২৬, ২৭, ২৮ নং ধারাগুলিতে এরকম বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। এখন ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি প্রস্তাবনা থেকে বাদ দেবার চেষ্টা হচ্ছে। শোনা যায়, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে প্রত্যেক সাংসদকে সংবিধানের যে কপি দেওয়া হয় তাতে প্রস্তাবনায় Socialist এবং Secular শব্দ দুটি ছিল না। এই নিয়ে হৈ চৈ হলে বলা হয়—ভুলক্রমে হয়েছে। বলা হচ্ছে ঐ শব্দ প্রথম থেকে প্রস্তাবনায় ছিল না, ১৯৭৭সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার ৪২তম সংশোধনীতে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' শব্দটি প্রস্তাবনায় ঢুকিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি আরোপিত। এটাই তাদের বক্তব্য। কিন্তু তারা বলছে না, বারবার বিভিন্ন মামলার রায়ে এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তি। এস আর বোম্মাই ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার বিখ্যাত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আহমদি মনে করিয়েছিলেন, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা দাঁড়িয়ে আছে সকল ধর্মের 'সহাবস্থান এবং সহিষ্ণুতার' নীতির ওপর। কিন্তু রাষ্ট্র নিজে নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারে যারা আছেন বারবার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তারা সেই লক্ষণ রেখা পার করে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের শুধু পৃষ্ঠপোষক নয়, নেতার ভূমিকা পালন করছেন।

হিন্দুত্ববাদীরা নানা কৌশল করে টিঁকে থাকে

১। বারে বারে গিরগিটির মতো রঙ পাল্টেছে এরা। হিন্দুরাষ্ট্রের স্লোগান আস্তিনের তলায় রেখে গান্ধী হত্যাকারী, তীব্রভাবে সমাজবাদবিরোধী এই শক্তি ১৯৮০-র দশকে 'গান্ধীবাদী সমাজবাদ'-এর ধুয়ো তুলতে লজ্জিত হয়নি। আবার তারপরে তারা তুলেছে 'স্বদেশী'-র স্লোগান। অথচ পরাধীন ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তারা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির দালাল, অনুচর। বর্তমানেও কি অর্থনীতি, কি বিদেশনীতি সবক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাদের আনুগত্য।

২। এদের কার্যধারার এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কৌশল হল আরএসএসের পরিচালনায় একটি বিশাল নেটওয়ার্কের ভেতর অসংখ্য সংগঠন সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আপাতভাবে পৃথক পৃথক লক্ষ্যে কাজ করে। এদের একটিকে দিয়ে হিংসাত্মক অপরাধ ঘটানোর পর কখনও যদি দেশের আইনের বলে সেই সংগঠনটিকে দমন করা হয়, তাহলেও মূল আরএসএস এবং তার অন্য

● অষ্টম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

ত্রিপুরায় কেমন চলছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার

মহুয়া রায়
সাধারণ সম্পাদক, ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুরু হয় ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়ার পরিকল্পনা। বিশেষ করে পরিকল্পনা কমিশন বাতিল করে নীতি আয়োগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে বঞ্চনা আরো বেড়ে যায়। দেশের প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি সহ এক ঝাঁক নেতামন্ত্রীরা ডাবল ইঞ্জিনের বিভিন্ন সুবিধা প্রচার করতে শুরু করেন। সারা রাজ্যজুড়ে সমস্ত অংশের জনগণকে প্রলুব্ধ করার জন্য প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচন ঘনিয়ে এলে ২৯৯টি লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্বলিত **“ভিশন ডকুমেন্ট”** প্রকাশ করা হয়। বেকার যুবক, শিক্ষক কর্মচারী, চুক্তিবদ্ধ, অনিয়মিত, ফিক্সড পে, ১০৩২৩ শিক্ষক, ভাতা প্রাপক, রেগা শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের সমস্ত অংশের জনগণকে প্রলুব্ধ করেই ২০১৮ সালে বিজেপি, আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়।

২০১৮ থেকে ২০২৩ সত্যিই পাল্টে গেল ত্রিপুরা। এক সময়কার রেগায় প্রথম, স্বাক্ষরতায় শীর্ষ স্থান, রক্তদানে প্রথম, সারা দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা রাজ্য অপরাধের শীর্ষে থাকা রাজ্যগুলোর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২২ সালে অপরাধের শীর্ষে থাকা ১০টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরার স্থান ৫ম। খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ, তোলাবাজি, ডাকাতি, ড্রাগ পাচার, নারী পাচার, মানব পাচার ইত্যাদি তথ্যে যা দেখানো হচ্ছে বাস্তবে তা আরো ভয়াবহ। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে এখন আর সমস্ত অপরাধ নথিভুক্ত করা হয় না।

মানবপাচার, এইচ আই ভি সংক্রমণ এবং বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে এগিয়ে ত্রিপুরা। আন্তর্জাতিক সীমান্তে ঘেরা ছোটো রাজ্য ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই অন্যতম করিডোরে পরিণত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে এন আই এ টিম ত্রিপুরা থেকে মানব পাচারের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, এদের প্রত্যেকেই বর্তমান শাসকদলের নেতাকর্মী। যুবতী ও নারী নিখোঁজের ঘটনা দ্রুতহারে বেড়েছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও মায়ানমারের নারীরাও ত্রিপুরার মধ্য দিয়েই ব্যাপক সংখ্যায় পাচার হয়ে যাচ্ছে।

নেশাদ্রব্য ব্যবহারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এইচআইভি সংক্রমণ। বাদ যাচ্ছে না স্কুল পড়ুয়ারাও। কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পাঁচশতাধিক স্কুল পড়ুয়া এইচআইভি আক্রান্ত। প্রকৃত অবস্থা আরো ভয়াবহ।

কাজ, খাদ্যের অভাবে সাধারণ শ্রমজীবী পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বাড়ছে ড্রপ আউটের সংখ্যা। মেয়েরা ঘরেও এখন নিরাপদ নয়। দরিদ্র পিতামাতা নাবালিকা কন্যাকে কোনোভাবে পাত্রস্থ করে দায় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে চাইছেন। ফলে বাড়ছে বাল্যবিবাহ।

প্রতারিত যুব সমাজ ও সাধরণ মানুষ। বছরে ৫০ হাজার চাকুরি, ২০১৯ সালে ঘোষিত ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি ছিল। সরকারের তরফ থেকে এখন বলা হচ্ছে, এ রাজ্যের বেকাররা নাকি এখন আর চাকুরি করতে চাইছে না। এরা স্বনির্ভর উদ্যোগপতি আরো বেশ কিছু যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে সারা রাজ্যে প্রচারিত ৭ লক্ষ বেকারের গল্পও এখন শেষ হয়ে গেল। মন্ত্রিসভার সদস্য তথ্য প্রকাশ করে বললেন, রাজ্যে নাকি চাকুরি প্রার্থী বেকারের সংখ্যা ২ লক্ষের কিছু বেশি। বহুল প্রচারিত তথ্যের বাকি ৫ লক্ষ বেকারের কোথায় কর্মসংস্থান হল, কারো জানা নেই। সরকারী তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর থেকে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে চাকুরি প্রার্থী যুবক যুবতীর সংখ্যা বেড়েছে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার। এছাড়া রয়েছে পিএইচডি করা এবং পিজি ডিপ্লোমাধারী নথিভুক্ত চাকুরী প্রার্থীরা। বর্তমান সরকারের নিয়োগনীতির কারণে অল্প শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীরা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করতে চাইছেন না। নাহলে সংখ্যা আরো বেশি হত।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ধ্বংসের কিনারায়। বামফ্রন্ট সরকার পরিবর্তনের পর এমন প্রচার শুরু হল, যেন এ রাজ্যে বিগত দিনে শিক্ষা বলে কিছু ছিল না। শিক্ষক কর্মচারীরা নাকি সবসময় মিটিং মিছিল করত। তাই নতুন নতুন শব্দ আমদানি করে গুনগত শিক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য নানা কাহিনী শুরু হল। আসলে বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে অর্থ লোপাট শুরু হল। শিক্ষা ক্ষেত্রকে বেসরকারীকরণের উদ্যোগ শুরু হল।

এরপর এলো বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি বিদ্যালয়কে এই প্রকল্পের অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে ৭৩টি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়কে ইংরেজী মাধ্যমে পরিণত করা হয়। পরে আরো ২৫টি স্কুলকে নেওয়া হয়। ঐসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতি বছর সেগুলির বিনিময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উন্নয়ন ফি হিসাবে ১২০০ টাকা সংগ্রহ করার কথা বলা হয়। কোনো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না করেই এই টাকা আদায় করা হচ্ছে। অথচ বিদ্যালয়ে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান দূরের কথা, শিক্ষকের অভাবে পঠন পাঠন লাটে উঠেছে, ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। পরিকাঠামোগত কোনো উন্নয়নের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বাড়ছে ড্রপ আউট, ভেঙে পড়েছে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় কলঙ্কিত ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটছে। প্রি-বোর্ড নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং হাজার হাজার টাকায় প্রশ্ন বিক্রি হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, আইজিএম হাসপাতাল সর্বত্র চলছে চিকিৎসক, নার্স, প্যারা মেডিকেল সহ সমস্ত ধরনের চিকিৎসাকর্মীর চরম অভাব। দাবি মেশিনগুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ফলে রাজ্যের প্রধান রেফারেন্স হাসপাতালে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জি বি হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর ভিড়। অথচ এখানেও কর্মী সঙ্কট তীব্র। পরিষেবা মিলছে না। সঠিক চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে অকালে অনেককেই মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে।

রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের সঙ্কট রাজ্যজুড়ে। বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার ধারাবাহিকভাবে সারা রাজ্যে নতুন নতুন সড়ক তৈরি করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বদনাম ঘুঁচিয়ে দিতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছিল। ডাবল ইঞ্জিন সরকার বিগত ৬ বছরের শাসনে নতুন সড়ক নির্মাণ স্তব্ধ করে দিয়েছে। যে সড়কগুলি তৈরি করা হয়েছিল সেগুলি রক্ষনাবেক্ষণ করতে পারছে না। মানুষ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে অধিকাংশ সড়ক।

একসময় ত্রিপুরা ছিল বিদ্যুৎ ঘাটতির রাজ্য। লোডশেডিং ছিল অন্যতম সমস্যা। বামফ্রন্ট সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে রামচন্দ্রনগর, বড়মুড়া, রুকিয়াতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পালাটানা ও মনারচকে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হলে ত্রিপুরা উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন রাজ্যে পরিণত হয়। বাংলাদেশ ও দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছু রাজ্যে ত্রিপুরার উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে লোডশেডিং শব্দটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম স্ব-নির্ভর হয়ে ওঠে। কর্মচারীদের বেতন ভাতা, ওটি (ওভারটাইম) মেরামত ইত্যাদি সমস্ত খরচ মিটিয়ে দেওয়ার পরও দপ্তর একটি উদ্বৃত্ত ফান্ড তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ৫টি ডিভিশনকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ নিগমে অর্থ লুঠ শুরু হয়। নানা কায়দায় ভোক্তাদের উপর অতিরিক্ত মাশুল চাপিয়ে দেওয়া শুরু হয়। বাড়তে থাকে রাজ্যজুড়ে লোডশেডিং। ঠিকেদারদের পাওনা বিল মিটিয়ে না দেওয়ার কারণে মেরামতির কাজ মুখ থুবড়ে পড়ে। ২০২৩ সালের ১ অক্টোবর থেকে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়। বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় সারা রাজ্যের মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়েছেন।

অটল জল ধারার ঢালাও প্রচার করা হলেও প্রতি ঘরে পাইপের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও অধরাই থেকে গেছে। রাজ্যে প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও পানীয় জলের দাবিতে, রাস্তা সংস্কারের দাবিতে, কোথাও বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তা অবরোধ করছে। বিজেপি দলের কর্মকর্তারা হুমকী, ধমক বা ভয় দেখিয়েও মানুষকে আটকে রাখতে পারছে না।

এডিসি এলাকার সাধারণ জনগণ গভীর সঙ্কটে রয়েছে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর স্ব-শাসনের অধিকার হল অন্যতম অধিকার। এই অধিকার অর্জনের লক্ষ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যে বামপন্থী দল ও সংগঠনগুলি এই অধিকার আদায় করেছিল। জাতি-উপজাতি উভয় অংশের গণতান্ত্রিক জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফসল হল এডিসি। প্রথমে সংবিধানের ৭ম তফশিল এবং পরে ৬ষ্ঠ তফশীল অনুযায়ী এডিসি গঠনের অধিকার আদায় হলেও স্বশাসনের অধিকারের পূর্ণ সুযোগ আদায় করা যায়নি। বামপন্থীরা বার বার দাবি জানিয়েছে এডিসি-র হাতে আরো অধিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করার জন্য। দেখা গেল এ রাজ্যের উপজাতিদের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মানোনয়নে যাদের কোনো ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি (সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়া) তারা হঠাৎ উপজাতি দরদী হয়ে স্বাধীন তিপ্রাল্যান্ড, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড-এর অবাস্তব দাবি তুলে সহজ সরল উপজাতিদের বিভ্রান্ত করে রাজ্যে মন্ত্রী, বিধায়ক হয়ে নিজের, পরিবারের, ঘনিষ্টদের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা ছাড়া কিছুই করেনি। এইসব তথাকথিত নেতারা যখনই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখনই নতুন মুখ, নতুন শ্লোগান সামনে চলে আসে। এডিসি-র নির্বাচন করতে সরকার বাধ্য হয়েছিল ত্রিপুরার মাননীয় হাইকোর্টের রায়ে। উপজাতি জনগণের প্রতি মেকি দরদ দেখিয়ে যারা এডিসি-র ক্ষমতায় এল তারা কিন্তু এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করতে পারেনি। এডিসি এলাকার উন্নয়নে, জনগণের উন্নয়নে এদের কোনো ভূমিকা নেই। উপজাতিদের স্বার্থবিরোধীদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, নানা সুবিধা পাওয়া, পাইয়ে দেবার জন্য ষড়যন্ত্র আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। মেকি উপজাতি দরদীদের মুখোশ এখনও আছে। এই মুখোশ যদি আমরা টেনে হিঁচড়ে খুলে দেওয়ার চেষ্টা না করি তাহলে উপজাতি সমাজের সর্বনাশ আটকাতে পারব না আমরা।

২০১৮ সাল থেকে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েই চলেছে। এর সংখ্যা হাফ সেঞ্চুরি হতে চলেছে। এই সময়ে কর্মচারী কমেছে ২০,১৩৮ জন। যার মধ্যে শিক্ষক কমেছে ১৬,৫০০ জন। প্রাথমিক স্তরে ১৫,৪০০ শিক্ষক কমেছে। চাকুরীহারা ১০,৩২৩ শিক্ষকদের চাকুরি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা সরকার তাদের আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে। এখন ১০,৩২৩ জন শিক্ষক অভাবে অনটনে মানসিক শারীরিক বিপর্যস্ত হয়ে দিন অতিবাহিত করছেন। এদের মধ্যে থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন ১৬৭ জন শিক্ষক। অসুস্থ অনেকেই, পরিবারগুলো অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বামফ্রন্ট সরকারের এ বিষয়ে সার্কুলারগুলি বাতিল করে প্রতিশ্রুতির খেলাপ করেছে। যদিও রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আইনের দ্বারস্থ হয়ে বিধানসভায় দু'জন অনিয়মিত কর্মচারী নিয়মিত হয়েছে।

ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কর্মচারীদের ডিএ বন্ধ করেই রাখে বলা যায়। যখন বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচন আসে তখন কর্মচারীদের ডিএ-র কথা মনে পড়ে। যদিও এবারের নির্বাচন ঘোষণার পূর্বের বিধানসভার ৩ দিনের অধিবেশনে ‘মহার্ঘভাতা’ নিয়ে তিন বিধায়কের প্রশ্নকে আড়াল করার চেষ্টা হয়। কিন্তু বিরোধীদের চাপের মুখে বাধ্য হয়েই ডিএ ঘোষণা করে দেওয়া হয়। তাও বকেয়ার পরিমানের তুলনায় যৎসামান্য।

নিয়মিত, অনিয়মিত কর্মচারী কমেছে। অবসরে গেছেন প্রায় একুশ হাজার। কর্মচারী কমেছে, কিন্তু খরচা বেড়েছে, খরচের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছে ১৫,০১৯ কোটি টাকা। কর্মসংস্থানের জন্য কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি, বরং টিআইডিসি অফিসে কোর্টের আদেশে গেটে তালা পড়েছে।

নতুন করে নিয়োগের জন্য টিপিএসসি থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। সরকারী দপ্তরগুলিতে প্রচণ্ড কর্মীসঙ্কট নিরসনে সরকার উদাসীন। বিধানসভার মতো জায়গায় এই প্রথমবার ৩৬ জন আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।

২০১৮ সাল থেকে চা-শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যেখানে ন্যূনতম পক্ষে ৫০-৭৫% সেখানে অন্যান্য শ্রমক্ষেত্রে ১০% থেকে ১৬% বৃদ্ধি হয়েছে।

গ্রুপ ডি কর্মচারীদের ওয়াশিং এলাউন্স পৃথকভাবে ট্রেজারিতে পাঠাতে হবে। অনুরূপ সিদ্ধান্ত শারীরিক প্রতিবন্ধী ভাতা এবং তাদের শিশুদের চাইল্ড কেয়ার ভাতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। একই অবস্থা ক্যাশ এলাউন্সের ক্ষেত্রেও। আসলে কর্মচারীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান থেকে সরকার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে অতি সন্তর্পণে।

যেমন সম্প্রতি আদেশনামা বেরিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, সেখানেও অনেক বাহারী কথা থাকলেও বছরে ৫০০×১২=৬০০০ টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে আমাদের অজান্তে। ইনস্যুরেন্স রিনিউ প্রতি বছর হবে সেটার নিশ্চয়তা নেই।

উত্তর পূর্ব ভারতের ছোট্ট পাহাড়ী যে রাজ্যটা দেশের বড় বড় রাজ্য, যে রাজ্যগুলো আর্থিক ব্যবস্থায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে বলা চলে সেসব রাজ্যকে অনেক বিষয়ে পিছনে ফেলে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে এগিয়ে গিয়েছিল তা আজ ধ্বংসের কিনারায়। একথা এ কারণে উল্লেখ করলাম। নিজস্ব সহায় সম্বলহীন পার্বতী ত্রিপুরা রাজ্য মানব উন্নয়নের প্রশ্নেই হোক কিংবা পরিকাঠামোগত উন্নয়নই হোক সব বিষয়ে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। সেই জায়গায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার মিলে ডাবল ইঞ্জিন বিজ্ঞাপন সর্বস্ব সরকারের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ ত্রিপুরাবাসীর চাক্ষুষ করবার সুযোগ প্রতিদিন ঘটছে। কাজেই সুযোগ এসেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের পরিবর্তন ঘটানোর। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সচেতন নাগরিক সমাজ যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

আমাদের করণীয়

পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জীবন-জীবিকার স্বার্থে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির জয়ী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে ও বোর্ড কর্পোরেশনের কর্মচারীদের কাছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের নিয়োগকর্তা নির্ধারিত হবে না ঠিক, কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে কেন্দ্রে একটি কর্মচারী বান্ধব সরকার গঠিত হলে তাদের অনেক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের পক্ষে যখন গৃহীত হয়, তার জের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ইতিবাচক দিকে প্রভাবিত করে। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন ছিল আই কে গুজরালের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার। এই সরকারকে বামপন্থীরা বাইরে থেকে সমর্থন জানায়। পঞ্চম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশকে উন্নত করে (সর্বত্র ফিক্সেশন ফর্মুলায় বিশ শতাংশ বুস্টিং-এর পরিবর্তে চল্লিশ শতাংশ) কার্যকর করা হয়েছিল। এর সুফল রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও পেয়েছিল রাজ্য বেতন কমিশনের মাধ্যমে। একই চিত্র ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশের ক্ষেত্রেও হয়েছিল।

দেশে বামপন্থী শক্তি বৃদ্ধির। ফলে কেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প সরকার গঠিত হলে সাধারণ মানুষেরও উপকার হয়। ২০০৪ সালে বামপন্থীদের সমর্থনে ইউপিএ-১ সরকারের আমলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো সম্ভব হয়েছিল। যেমন, ১০০ দিনের কাজ, বনাঞ্চল আইন, গার্হস্থ্য হিংসা নিরোধক আইন, তথ্যের অধিকার, স্বামীনাথন কমিশন গঠন করে কৃষি ক্ষেত্রকে সুরক্ষিত করা, মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক সমস্যা নির্ধারণে সাচার কমিটি গঠন প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, বেশ কিছু জনবিরোধী বিল আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। বামপন্থীদের চাপে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত প্রথম ইউপিএ সরকার স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

কেন্দ্রে বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করলে একদিকে যেমন দেশকে, দেশের সংবিধান-বহুত্ববাদ-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করা সম্ভব, অপরদিকে সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী দুই ঘৃণ্য অপশক্তিকে পরাস্ত করতে পারলে জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে প্রশাসনের অভ্যন্তরে দায়িত্বশীল কর্মচারী হিসাবে অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার পাশাপাশি একজন নাগরিক হিসেবে, একজন অভিভাবক হিসেবে জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে সংবিধান বর্ণিত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে হবে আমাদের। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

যে কোনো মূল্যে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা কর

উপাঙ্গগুলো কাজ করে যেতে থাকে। কোনো সংগঠনকে তারা নিজেরাই সময় বুঝে গুটিয়ে ফেলে। নাথুরাম গডসের বিচারের সময় সে বলেছিল আরএসএসের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, সে হিন্দু মহাসভার সদস্য এবং নাথুরাম ব্যক্তিগত দায় স্বীকার করে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেল আরএসএসের ফ্যাসিস্ট চরিত্র এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ২২ নভেম্বর, ১৯৯৩ সালে এল কে আদবানী বলেছিলেন, গডসের সঙ্গে আর এস এস-এর সংযোগ ছিল না। এর উত্তরে নাথুরামের ভাই গোপাল গডসে, যিনি নিজেও গান্ধীহত্যা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন, এ জি নুরানীর নেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, নাথুরাম সহ তাঁরা চার ভাই সকলেই আর এস এস-এর সদস্য ছিলেন, নাথুরাম কোনোদিন আর এস এস ত্যাগ করেননি। (২৪ জানুয়ারি, ২০২৪, ফ্রন্টলাইন) ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮-এ আরএসএসকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং ২৫০০০ সদস্যকে জেলে পোরা হয়। হিন্দু মহাসভা কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়া এড়াতে নিজেদের রাজনৈতিক কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলেছিল বেশ কয়েকমাস, তারপর আবার গোপনে শুরু করে।

২০১৩ সালে নরেন্দ্র দাভোলকর, ২০১৫ সালে এম এ কালবুর্গি, ২০১৭ সালে গোবিন্দ পানসারে এবং গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকান্ডের অভিযুক্তরা সকলেই সনাতন সংস্থা এবং তার সহযোগী হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির। যাঁদের হত্যা করা হয়েছে তাঁরা সকলেই তাঁদের যুক্তিনির্ভর, প্রগতিশীল লেখা বা কাজের জন্য হিন্দুত্ববাদীদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছিলেন।

লঙ্কেশ হত্যাকান্ডের তদন্তের সময়ে অভিনব ভারত বলে একটি সংগঠনের সঙ্গে সনাতন সংস্থার যোগাযোগ বেরিয়েছে। ২০০৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণে যুক্ত আরএসএস প্রচারক অসীমানন্দের সহযোগী শ্রীকান্ত পুরোহিত ছিল এই অভিনব ভারতের সদস্য। ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের মালেগাঁও বিস্ফোরণ। ভিএইচপির মহিলা শাখা দুর্গা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা সাধ্বী ঋতম্ভরা ইত্যাদিরা তাতে যুক্ত ছিলেন। কর্মরত সেনা অফিসার শ্রীকান্ত পুরোহিতও ঐ মামলায় ধরা পড়েন। এইভাবে কখনও আইনী কখনও বেআইনী পথে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো কাজ করে। সেনা বাহিনী সহ রাষ্ট্রের সবকটি উপাঙ্গে তারা দীর্ঘদিন ধরে অনুপ্রবেশ করেছে।

স্বাধীনতার আগে থেকেই এক গোপন সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক কাজ করে হিন্দুত্ববাদী আরএসএসের ছত্রছায়ায়। গান্ধীজী জীবনের শেষদিকে এদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের ধারা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। বলতেন, এরা মুখে বলে এক, কাজে করে আরেক। পুলিশের রেকর্ডেড তথ্য অনুযায়ী গান্ধী হত্যার আগে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আরও পাঁচবার হিন্দুত্ববাদীরা তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছিল।

এক দেশ, এক ভোট

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের আগে যে সিএএ চালু করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার তাতে এটা পরিস্কার যে ক্ষমতায় এসে তারা হিন্দু রাষ্ট্রের দিকে এগোবে। মুখে এক দেশ, এক ভোট বলছে, তারা এক দেশ, এক জাতি, এক ভাষার হিন্দুরাষ্ট্রের সামনে সব বাধা উড়িয়ে দেবার জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অধিকার কেড়ে নিতে দ্বিধা করবে না।

ট্রেড ইউনিয়নের করণীয়

১। আজকের ভারতে কর্পোরেট শক্তি আর হিন্দুত্ব সমস্ত জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে জোট বদ্ধ। নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে, কর্পোরেটের সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে করা যাবে না।

২। এই লড়াই করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে জনগণের মধ্যে যারা আজ হিন্দুত্ববাদীদের সমর্থক তারা সবাই সাম্প্রদায়িক নয়, যারা সাম্প্রদায়িক তারা আবার সবাই ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট নয়। শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের লড়াইয়ের দিশা ঠিক থাকলে সাম্প্রদায়িকতা পিছু হঠে, আমাদের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ইতিহাসেই এর নিদর্শন আছে। কুখ্যাত কলকাতা দাঙ্গার সময়ে ট্রাম শ্রমিকদের ভূমিকা, ঐ সময়েই বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমিক-কৃষকদের ভূমিকা ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু গল্প ৪০ দশকের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চেতনার দলিল হয়ে আছে। সে সব ইতিহাস, সাহিত্য আমাদের ফিরে ফিরে পড়া দরকার।

৩। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দেওয়া যায়। দেশভাগের পর এখানকার মানুষের ওপর সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু ১৯৪৮-এর পর এদের প্রভাব কমে গেল। ৭০ ও ৮০ দশকে এরা যখন উত্তর ভারতে নতুন করে জমি তৈরি করছে তখনও পশ্চিমবঙ্গে তারা মানুষের সমর্থন পায়নি। এর একমাত্র কারণ হল এখানকার শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলনে ধারাবাহিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রচার। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান যেমন এরাজ্যে কংগ্রেসকে দুর্বল করেছিল, তেমন তারাই প্রথম বিজেপিকে নির্বাচনে একটি আসন পেতে সাহায্যও করেছিল।

এরপর ২০১১ সালের বামপন্থীদের সরিয়ে তারা রাজ্য সরকারে আসার পর দিনে দিনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ যত ধ্বংস হয়েছে,সঙ্ঘ পরিবারের সমস্ত সংগঠনের হুহু করে বেড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। তাই এই রাজ্যে তৃণমূল বা বিজেপি ওপর ওপর যত বিরোধিতাই দেখাক, শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থের পক্ষে উভয়ই ক্ষতিকর। তাই এখানে শ্রমিক কর্মচারীদের বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম একই সঙ্গে করতে হচ্ছে।

সবশেষে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা—আজ যখন গোটা দেশ ফ্যাসিজমের দোরগোড়ায় জনগণের নিজেদের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান দরকার। ট্রেড ইউনিয়ন সেই ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, জীবনজীবিকার ক্ষতির যন্ত্রণা থেকে মানুষ পরিত্রাণের উপায় চিনে নেবে। □

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

ইতিহাসের বিকৃতি

বাজারদরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করেছিলেন। ইসলামিক আইনকে গুরুত্ব না দিয়ে রাজ্য শাসনে সুলতানের সিদ্ধান্তই শেষ কথা বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু জমিদারদের (একই সঙ্গে মুসলিম ইক্তাদারদের) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যই তাকে ধর্মান্ধ বলে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। হরবংশ মুখিয়া মধ্যযুগের ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন মধ্যযুগের ভারত রাষ্ট্র ছিল 'negetively secular' অর্থাৎ এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম, রাজনীতির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। উলেমাদের সুলতানরা নিযুক্ত করতেন তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমর্থনে প্রচারের জন্য। অর্থাৎ ধর্মীয় নীতি নয়, রাজনৈতিক বাস্তবিকতার ভিত্তিতেই মধ্যযুগে ভারতের মুসলিম শাসকেরা তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

গজনীর সুলতান মাহমুদের একাধিকবার সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠনের কথা বহুল প্রচলিত। সুলতান মাহমুদ ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং ইসলাম ধর্ম পৌত্তলিকতার বিরোধী, তাই মাহমুদ মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করেছেন—এই বক্তব্য রাখেন হিন্দুত্ববাদীরা। এই ব্যাখ্যার বিপরীতে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার একাদশ শতকের কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষের উদাহরণ দেখান। কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে হর্ষ 'দেবোৎপাটন নায়ক' নামে একজন বিশেষ আধিকারিককে নিয়োগ করেছেন যার কাজই ছিল মন্দির লুঠ করা। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের শাসক নন, সব ধর্মের শাসকরাই মন্দির লুণ্ঠন করতেন মন্দিরের সম্পদের লোভে, কখনও কখনও শাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখতে।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাতে পরবর্তীকালে বৃটিশ প্রশাসনের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। বাবরি মসজিদকে নিয়ে বর্তমান ভারত তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, ধ্বংসের সাক্ষী হয়েছে। এমনকি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত 'বিশ্বাস'-এর উপর ভিত্তি করে রায় দিয়ে দিয়েছে যে বাবরি মসজিদের স্থানেই রামমন্দির বানানো হবে। জাঁকজমক সহযোগে এ বছরের ২১ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধনও হয়ে গেছে। কিন্তু এই সঙ্কটের সূচনা হয়েছিল বৃটিশ প্রশাসনের মিথ্যা বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে। এজি নুরানী 'The Babri Masjid Question 1528-2003' বইয়ে লিখেছেন যে, ১৮৮৫ সালের ২৯ জানুয়ারি ফৈজাবাদ জেলা আদালতে মহন্ত রঘুবীর দাস ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের বিরুদ্ধে একটি মামলা করে অযোধ্যার জনম আস্থান নামক চবুতরার (প্ল্যাটফর্ম) উপর একটি মন্দির বানানোর অনুমতি চায়। চবুতরাটি বাবরি মসজিদ থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত ছিল, যদিও একই চত্বরের মধ্যে ছিল। হিন্দুরা এই চবুতরাটি রামচন্দ্রের জন্মস্থান হিসেবেই পুজো করত। মহন্ত তার আবেদনে বাবরি মসজিদ নিয়ে কোনো আবেদনই করেননি। জেলা জজ ই.ই.এ জ্যামিয়ের ১৮ মার্চ, ১৮৮৬ সালে আবেদনটির উপর শুনানির পর তা নাকচ করেন। কিন্তু তার সঙ্গে জুড়ে দেন একটি বিযাক্ত মন্তব্য—"It is most unfortunate that a masjid should have been built on land specially held sacred by the Hindus, but as the event occurred 356 years ago, it is too late now to remedy the grievances." এরকম কোনো ক্ষোভের কথা মহন্ত আদৌ তার আবেদনে জানাননি। পরবর্তীতে ১ নভেম্বর অযোধ্যার জুডিশিয়াল কমিশনার আবেদনটি বাতিল করে আরও বিযাক্ত একটি মন্তব্য জুড়ে দেন—"A mosque erected some 350 years ago owing to the bigotry and tyranny of the Emperor Babur, who purposely chose this holy spot according to Hindu legend as the site of his mosque." আবেদনে যা ছিলই না, বিচারপতি নিজে সেই বক্তব্য তৈরি করে দিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইতিহাস বিকৃতির এক জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ এই ঘটনা। বৃটিশ বিচারপতির ১৮৮৬ সালের ১ নভেম্বরের রায়ের 'কিংবদন্তী' (legend) ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর ফিরে এল 'বিশ্বাস' হয়ে।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজনৈতিক কারণে ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রবণতা ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালে রাজস্থানে বিজেপি সরকার ইতিহাস বই পাল্টে প্রচার করে যে ১৫৭৬ সালের হলদিঘাটের যুদ্ধে রাণাপ্রতাপ মোঘলদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। রাণাপ্রতাপ এবং মোঘলদের মধ্যে যুদ্ধকে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধ বলে দেখানোর চেষ্টা করছে হিন্দুত্ববাদীরা, যদিও মোঘলদের নেতা ছিলেন মান সিংহ এবং রাণা প্রতাপের সেনাপতি ছিলেন আফগান হাকিম খান শুর। আবার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করা টিপু সুলতান হন সাম্প্রদায়িক।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রস্তাবিত স্নাতকস্তরের ইতিহাস পাঠক্রমের যে খসড়াটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ভারতের প্রাচীন, মধ্য তথা আঠারো শতকের ইতিহাস সম্পর্কে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও মিথ্যা, অবাস্তব কাহিনী ঢোকানো হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ভারত আর্যদের আদি বাসভূমি বলে দাবি করা, মহাকাব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা খোঁজা, হিন্দু-মুসলমান বিভেদের উপর জোর দেওয়া, আকবরের ভূমিকা অনুল্লেখিত রাখা। অর্থাৎ শিক্ষাক্রমেই বিকৃত ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার ভারত যেমন আকবরকে ভারতের ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাইছে, তেমনই পাকিস্তানের ইতিহাসেও স্থান হয়নি আকবরের। পাকিস্তানে বলা হয় আকবর হিন্দু ও রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা করে ইসলাম ধর্মের ক্ষতি করেছে। আর ভারতে বলা হচ্ছে আকবর খারাপ, কারণ আকবর ধর্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। আসলে আকবরের ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব হিন্দু ও মুসলিম---দুই প্রকার মৌলবাদের কাছেই বিপজ্জনক। এই উভয়প্রকার মৌলবাদকে ঠেকাতে গেলেই বিকৃতি মুক্ত ইতিহাসকে মানুষের কাছে উপস্থাপনার জন্য লড়াই জারি রাখতে হবে। □

চারের পৃষ্ঠার পরে

ইলেক্টোরাল বন্ড

সরকারী বা সরকার পরিচালিত অন্তত ৩৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা প্রায় ২১০৫ কোটি টাকা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মচারীদের থেকে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা জমা পড়েছে এই তহবিলে। আদানি গোষ্ঠী ১০০ কোটি টাকা, রিলায়েন্স গোষ্ঠী ৫০০ কোটি টাকা দিয়েছে এই তহবিলে। চার বছর পরও দেশবাসী জানতে পারল না কেন পি এম কেয়ার্স ফান্ড তৈরি করা হয়েছিল। অদ্যাবধি এই ফান্ড থেকে ৯৭৪১.৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। বাকি ১৩ হাজার ৪৬৬.২ কোটি টাকার কোনো হিসাব দেওয়া হয়নি। সিপিআই(এম), কংগ্রেস এই তহবিল নিয়ে প্রশ্ন তুলে সোচ্চার হয়েছে। এই ফান্ডের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ডি ওয়াই এফ আই।

দেশের সর্ববৃহৎ দুর্নীতি মামলার রায় প্রকাশিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় শাসকদলের মুখোশ খুলে পড়ে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই তথ্য তাদের বিপদ সৃষ্টি করতে পারে এই আশঙ্কায় মেরুকরণের রাজনৈতিকে সামনে এনে ২০১৯ সালে পাশ হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগুর বিজ্ঞপ্তি তড়িঘড়ি ঘোষণা করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। নির্বাচনী বন্ডের দুর্নীতি ঢেকে দিতে দ্রুত এই ঘটনা ঘটানো হল। বিভাজন ও মেরুকরণ ঘটাতেই সিএএ জারি করা হয়। সংবিধানে নাগরিকত্ব সম্পর্কে যে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বর্ণিত আছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে নাগরিকত্বের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচিতিকে যুক্ত করে সংবিধানের সেই নীতিকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। মামলা চলছে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদানের বৈধতা নিয়ে। তাছাড়া সিএএ বিচ্ছিন্ন একটা পদ্ধতি নয়, এর সঙ্গে আছে এন পি আর ও এন আর সি। শুধু মুসলমান নয়, সিএএ-র মধ্যে দিয়ে নাগরিককে বেনাগরিক করে ভীত সন্ত্রস্ত করে কেন্দ্রীয় শাসকদলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আসাম জ্বলছে, সেখানে ডিটেনসন ক্যাম্পের ৮০ শতাংশ হিন্দু। আসলে সিএএ-র মধ্যে দিয়ে সমস্যায় পড়বে গরিব হিন্দু মুসলমান মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলও আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে কেন্দ্রের সরকারের এই বিভাজনের রাজনীতি থেকে ফায়দা তুলতে চাইছে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক ভোটের লড়াইয়ে টেনে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করছে।

ধর্মের আগুনে রাজনীতিতে সেঁকা সিএএ-র জুজু সামনে এনে কেন্দ্রের ও রাজ্যের শাসকদল নির্বাচনী বন্ডে প্রকাশিত সর্ববৃহৎ দুর্নীতি থেকে মানুষের নজর ঘুড়িয়ে দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছে। আমরাও শ্রমজীবী মানুষের অংশ। এই লুটে খাওয়াদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইয়ে সামিল হতে হবে আমাদের এবং রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তনে আমাদের যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে। □

তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার ও অন্যান্য পত্রিকা

প্রসঙ্গ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

কুমকুম মিত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, লক্ষ্য নারীর ক্ষমতায়ন। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়মের বেড়াজালে বন্দী নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বন্দীত্বের শিকল ভেঙে আত্মপ্রকাশের উদ্‌যাপনের দিন এই ৮ মার্চ। এ লড়াই আজকের নয়, তবে আজও বহু ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অত্যাচারিত নারীরা। প্রাচীন যুগে কিন্তু ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। পরিবর্তনশীল জীবনে ক্রমশ সমাজব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিকে পরিণত হয়।

আবার পরিবর্তনশীল সমাজে যেভাবে একটু একটু করে নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করে নিতে পারছে মহিলারা তা অভাবনীয়। ৮ মার্চ নারী দিবস শুধুমাত্র মহিলারাই প্রতিবাদ প্রতিরোধের দিন হিসাবে পালন করেন বা তাদের গর্বের দিন তা নয়। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত মানুষ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই দিনটিকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান জানায় সেই মহীয়সী নারী শ্রমিকদের। আবার কর্পোরেট দুনিয়া এই দিনটি বিভিন্ন প্রলোভনের টোপ দিয়ে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহার করে। প্রতি বছরই এই দিনটি নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে ও নতুন একেকটি বিষয় নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। এবারেও আন্তর্জাতিকভাবে তেমনই একটি বিষয় স্থিরীকৃত হয়েছে—“Invest in Women, Accelerate Progress”, অর্থাৎ বিনিয়োগের মাধ্যমে নারীর উন্নয়নকে দ্রুততর করা। এবং ক্যাম্পেন-এর বিষয় হল—“Inspire Inclusion”, এই ক্যাম্পেনের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে বৈচিত্র ও ক্ষমতায়নের বিষয়গুলি তুলে ধরা, সমাজের সবক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পুরুষ ও নারীর সমান অংশগ্রহণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে কথা মানুষকে বোঝানো।

বর্তমানে সারা বিশ্ব তথা দেশ ও রাজ্যের যা পরিস্থিতি, তাতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কারণ আজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীরা আক্রান্ত। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মর্যাদা রক্ষা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই নারীরা আক্রান্ত, যার থেকে মুক্তি বা উত্তোরণ প্রয়োজন। এমনকি এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও দেশের সরকার যে অপমানজনক বিষয়টি ঘোষণা করেছে যে, “বিয়ের পরে মেয়েরা যদি বাপের বাড়ির পদবী ব্যবহার করতে চায়, তাহলে স্বামীর অনুমতি লাগবে”, এই অপমানের জবাব চাওয়ার দিন এই ৮ মার্চ।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে মহিলা শ্রমিকদের আন্দোলনের ফল এই বিশেষ দিন, ঐ দিনই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বীজ বপন হয়। আর আজও মহিলারা বিভিন্নভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত, আক্রান্ত হচ্ছে। লিঙ্গ বৈষম্য, লিঙ্গ সমতা তৈরি করা, প্রজনন ক্ষমতা সংক্রান্ত নারীর অধিকার, মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা ও অত্যাচারের ঘটনা এই বিষয়গুলো নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে ও সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে এই দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৮৫৭ সালে যখন আমাদের দেশে সিপাহী বিদ্রোহের দামামা বাজছে এবং সেই সময়েও ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো মহিলা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ঠিক তখনই পৃথিবীর অপর গোলার্ধে ১৮৫৭ সালে নিউ ইয়র্কের দর্জি মেয়েরা মজুরী বৃদ্ধি ও কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে উত্তাল আন্দোলন গড়ে তোলেন, যা সংগ্রামের বহমানতায় এক চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

সংগ্রামের বহমান স্রোতেই আমরা ‘নারী দিবস’কে পালন করি ও উপলব্ধি করি, শুধু একটি প্রতীকী দিন হিসাবে নারীর জয়গাথা উচ্চারণ করা নয়। প্রকৃত অর্থে যখন প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন দিক থেকে নারীদের শোষণ-বঞ্চনার যাঁতাকলে পিষে দেওয়া হচ্ছে, তখন সংগ্রাম-আন্দোলনের বহমানতা নারীদিবসের পরম্পরাকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃপ্ততায় আমরা পথ চলি। আজও সারা বিশ্বে বা দেশে মেয়েরাই তো সমস্ত প্রশ্নের আগে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

জায়নবাদী ইজরায়েল যখন গাজাকে ধ্বংস করতে উদ্যত, তারা যখন প্যালেস্তাইনে একের পর এক আক্রমণ করছে, তখন যে ৩০ হাজার মানষের মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে ১৬ হাজারই তো হচ্ছে নারী ও শিশু। স্বভাবতই এই হিংসা, এই রক্তপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি দিন হবে অবশ্যই ৮ মার্চ। যখন জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে বিশ্বে একের পর এক বিপর্যয় হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে সবুজ, জন-জীবিকা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থ, তখন পুঁজিবাদের এই জিঘাংসা তার জন্য দায়ী। তার সরাসরি আক্রমণে সবচেয়ে আগে ক্ষতিগ্রস্থ হয় প্রান্তিক মানুষ তথা মহিলারা। তাহলে পরিবেশ রক্ষা করার দাবি তোলার দিন, আর পরিবেশ ধ্বংসকারী কর্পোরেটদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার দিন হবে এই ৮ মার্চ নারী দিবস।

আমাদের দেশে মহিলা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় যে জয় ছিল ১৯৯৬ সালে দেবেগৌরার প্রধানমন্ত্রীত্বে, তৎকালীন বামপন্থী সংসদ গীতা মুখার্জীর নেতৃত্বে সংসদে মহিলা বিল পেশ ও পাস করানো। কিন্তু দেশের পরবর্তী সরকারগুলো এই বিলকে কার্যকরী করেনি। এখন বিজেপি সরকার বা মোদিজী এর কৃতিত্ব নিতে চাইছেন, অথচ ২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল এই বিলকে কার্যকরী করার। কিন্তু যখন মোদিজী ক্ষমতায় এলেন তখন এই বিলকে বাস্তবায়িত করার মতো সমস্ত পরিস্থিতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও এই বিল কার্যকরী করেনি। তাহলে আজ সংসদে বা বিধানসভাতেও মেয়েরা আরো বেশি সংখ্যায় দাঁড়াতে পারতো। এখন আবার এর সাথে জুড়েছে জনগণনা, ডিলিমিটেশন, সুতরাং এই বিল কবে কার্যকরী হবে তা একটি বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

Annual Gender Gap Report 2023-এ প্রকাশিত ভারত ১৪৬টি দেশের মধ্যে ১২৭তম স্থানে আছে লিঙ্গ সমতার মাপকাঠিতে। সারা দেশজুড়ে কন্যাভ্রূণ হত্যা এখনো আছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, মজুরী সব প্রশ্নেই বৈষম্য বিরাজমান। কোভিড লকডাউন পরিস্থিতিতে যে হারে বেকারী বৃদ্ধি হয়েছে তার মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মেয়েরা, বেকারীর হার তাদের মধ্যে বেড়েছে অনেক বেশি। এই সময়ে বন্ধ হয়েছে স্কুল, বেড়েছে স্কুলছুটের সংখ্যা, যার বেশিরভাগই হচ্ছে মেয়েরা। অথচ কন্যাসন্তানদের যদি উপযুক্ত কর্মমুখী শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই পুষ্টি সহ সমস্ত ক্ষেত্র উন্নত হতে পারে। স্কুলছুট বেড়ে যাওয়ায় এইসময় বহু মেয়ে কম বয়সে বিয়ে (Teenage marriage) করে নেয় বা বাড়ি থেকে বিয়ে দেওয়া হয় এবং বৃদ্ধি পায় Teenage Pregnency, যা মা ও শিশুর দু’জনেরই স্বাস্থ্যর পক্ষে, সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার এইসময় ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আয়রন ফলিফার, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট প্রয়োজনের তুলনায় এত কম সরবরাহ ছিল তাতেও মা ও শিশুরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মহিলাদের কাজের জায়গার ক্ষেত্রেও দেখা যায় এমন অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় তাদের টানা কাজ করতে হয়, যে তারা নানান মহিলাঘটিত রোগের শিকার হন। কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা,

● দশম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেট ঃ শুধুই কথার ফুলঝুরি

উৎসর্গ মিত্র

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কারণে এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে লোকসভায় পেশ হয়েছে ‘অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট, ২০২৪’। যেহেতু সামনেই লোকসভা ভোট এবং সংবিধান অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে গেলে পূর্ণ সময়ের সরকার দরকার, সেহেতু এ বছর সে কাজ করবে নবগঠিত সরকার। এখন ততদিন সরকারের কাজটুকু চালানোর জন্যে পেশ করা হলো এই ‘অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট’। সুতরাং একে বিশ্লেষণ করলে সরকারের ‘ভিশন’-এর প্রায় কিছুই বোঝা যাবে না। সেটা বুঝতে গেলে সরকারের প্রাক-বাজেট ‘ইকনমিক সার্ভে’কে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তাহলেই বোঝা যাবে গত বছর সরকার বাজেট পেশের সময়ে কী বলেছিল এবং তারপর সরকারটা কি ভাবে চালিয়েছে। বোঝা যাবে সরকারের আসল দৃষ্টিভঙ্গী। বোঝা যাবে এই সরকারই আগামী দিনেও বজায় থাকলে কী করতে পারে তারা।

এই ‘ইকনমিক সার্ভে’ নেট দুনিয়ায় সহজলভ্য এবং এটিকে খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোটেই সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, বরং তা ক্রমেই এক বিপজ্জনক আকার নিচ্ছে। নানা বাগাড়ম্বরের আড়ালে মোদি সরকারের লক্ষ্য যে আসলে ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও দারিদ্র্যের দিকেই ঠেলে দেওয়া, তা ছত্রে ছত্রে পরিস্ফূট এই ইকনমিক সার্ভেতে।

এটা ঠিক যে ২০২৩-২৪ সালে রাজস্ব খাতে দেশের আয় বৃদ্ধি ঘটেছে তার আগের বছরের তুলনায় ১৩.৩ শতাংশ, কিন্তু তার পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, গত বছরের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ যা করা হয়েছিল, বাজেট ঘাটতি কমাতে প্রকৃত ব্যয় করা হয়েছিল তার থেকে অনেক কম। কেন্দ্রীয় সরকারের কেরামতিতে ক্রম-মূল্যবৃদ্ধির যুগে গত বছর সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে মাত্র ৭ শতাংশ, যা বাজেটে ঘোষিত আনুমানিক ন্যূনতম জিডিপি বৃদ্ধি ৮.৯ শতাংশের অনেক নীচে। সরকারের নিজস্ব খাতে ব্যয় অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সার্বিক ব্যয় এত কম হওয়ার অর্থই হলো কল্যাণকর প্রকল্পগুলিতে এবং মূলধনী ব্যয় অর্থাৎ স্থায়ী সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত প্রকল্পগুলিতে ব্যাপক হারে বরাদ্দ ছাঁটাই। এর ফলে দেশের আগামী আর্থিক পরিস্থিতি আরও অন্ধকারের দিকে চলে যেতে বাধ্য।

শুধু এই দুটি ক্ষেত্রই নয়, আগে থেকে চলে আসা এমন বেশ কিছু ক্ষেত্র, যেমন কৃষি ও সেই সংক্রান্ত ক্ষেত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ, তপসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সুরক্ষামূলক প্রকল্পর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির প্রায় সব কয়টিতেই গত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের থেকে কম ব্যয় করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী পোষণ যোজনার মত ক্ষেত্রগুলিতে বাজেট বরাদ্দের থেকে কম ব্যয় করা হয়েছে শুধু নয়, এগুলিতে এমনকি ২০২২-২৩ সালের থেকেও কম ব্যয় করা হয়েছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্যে প্রকল্পগুলিতে ব্যায়ের পরিমাণ ও সুবিধা প্রাপকদের সংখ্যা—দুটিতেই আগের বছরের তুলনায় চরম পতন লক্ষ্য করা গেছে। কৃষি-সার, খাদ্য সুরক্ষা, MNREGA ও শহরোন্নয়নের অবস্থাও তথৈবচ। শুধুমাত্র খাদ্য ভরতুকিতেই ৬০,৪৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছাঁটাই হয়েছে, সারে ছাঁটাই হয়েছে ৬২,৪৪৫ কোটি টাকা। মূলধনী ব্যয় সামাল দেওয়ার জন্যে রাজ্যগুলিকে দেওয়া ধারের পরিমাণে ব্যাপক হারে ছাঁটাইয়ের ফলে রাজ্যগুলির অসুবিধার মধ্যে পড়ার কথা এবং তারা সেটা গত বছরে পড়েছেও। জিএসটি-র পরিবর্তে রাজ্যগুলিকে এই ধার দেওয়ার কথা ছিল এবং কথা ছিল, জিএসটি প্রাপ্ত হলে তারা এই ধার মিটিয়ে দেবে। এখন উভয় ক্ষেত্রেই রাজ্যগুলির অপ্রাপ্তি থেকে যাওয়ার ফলে তারাও বাধ্য হচ্ছে তাদের নিজস্ব প্রকল্পগুলিতে ছাঁটাই নামিয়ে আনতে।

প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যয় সংকোচন ও রাজস্ব আদায়ের তথাকথিত তুলনামূলক আধিক্য এসেছে উন্নয়নের এক অতীব করুণ চিত্রের পটভূমিতে। কিন্তু এই আবহের মধ্যেও সরকার তার যথাসাধ্য কাজ করে গেছে বড়ো এবং ধনী কোম্পানীগুলি যাতে আরও ধনী হতে পারে, তার লক্ষ্যে। কাগজে-কলমে রাজস্ব আদায়ের যে বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে প্রাক্-কোভিড কালের তুলনায় তার কারণ এই নয় যে রাজস্ব আদায়ের ওপর বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে বা ধনীদের ওপর করের হার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আসল কারণ হলো এই যে, কোভিড পরবর্তী কালে সরকারের বদান্যতায় বৃহৎ কোম্পানীগুলির আয় বেড়েছে বহুগুণ। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে ধনীরা সরকারের সাহায্য নিয়ে তাদের আয় বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে, অপর দিকে গরীব মানুষ এই সাঙ্ঘাতিক মূল্যবৃদ্ধির যুগে বাধ্য হয়েছে কম মজুরীতে বেশি পরিমাণ শ্রম দিতে। অবশ্য বিজেপি সরকারের নীতিই এইটা। মুখে যতোই ‘সামাজিক সমানাধিকার’, ‘সামাজিক ন্যায় বিচার’ ইত্যাদির মতো বড়ো কথা বলা হোক না কেন, আসলে এই সরকারের কাজই হলো কর্পোরেট জগতের সন্তুষ্টির ব্যবস্থা করা—বৃহদাংশের জনগণের রুজি কেড়ে নিয়ে কিয়দংশের সেবা করা। এই বছরের অন্তর্বর্তী বাজেটে যেটুকু দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। যদি আগামী দিনে এই সরকারের পুনরাবৃত্তি হয়, তাহলে গরীব মেরে কর্পোরেট ভজনার দৃষ্টিভঙ্গীরও পুনরাবৃত্তি ঘটবে সন্দেহ নেই। সুতরাং আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(২)

এদিকে রাজ্যে এই বছর যে বাজেট পেশ হয়েছে, তাকে এক কথায় ‘উদ্দেশ্যবিহীন’ বললে ভুল বলা হবে না। এক দিকে সরকারের ধারের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে, অন্য দিকে সেই ধার মেটানোর জন্যে রাজস্ব আদায়ের অতিরিক্ত যে ব্যবস্থা করা দরকার, তার কিছুই করা হচ্ছে না। মজার কথা, সরকার সেটা স্বীকারও করছে না। ধার মেটাতে গেলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়ানো দরকার, সরকারি কাজের পরিধি বাড়ানো দরকার। এগুলোর কোনও দিশাই বর্তমান বাজেটে নেই। সরকার বলছে বটে কর্মী নিয়োগের ‘বিশেষ উদ্যোগের’ (Special Drive), কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বেকারের হাহাকার। বর্তমান রাজ্য বাজেটে পঞ্চাশ দিনের কাজের গ্যারান্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থই হলো একশো দিনের কাজের গ্যারান্টির যে আইন দেশের সংবিধানে রয়েছে, তার প্রতি মান্যতা দিতে ব্যার্থ হয়েছে রাজ্যের সরকার। নইলে একশ দিনের জায়গায় মাত্র পঞ্চাশ দিনের কাজের গ্যারান্টির কথা উল্লেখ করতে হতো না। মনে রাখতে হবে যে এই পঞ্চাশ দিন কিন্তু একশোর অতিরিক্ত পঞ্চাশ নয়। তা শুধুই ‘পঞ্চাশ’।

করোনার পরে, ২০২২-র বাজেট পেশ করতে গিয়েও সরকার দাবি করেছিল, মহামারীর এক বছরে তারা ৩০ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিল। সেবার বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন, “আগামী ৪ বছরে আমরা সরকারি ক্ষেত্রে, বেসরকারি ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ও স্বনিযুক্তির মাধ্যমে ১.২০ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারব।” ২০২৩-র বাজেটে তার কোনও হিসাব ছিল না। এবার সেই কর্মসংস্থানের দাবিটুকুও রাখার সাহস দেখাতে পারেনি মমতা ব্যানার্জির সরকার! অথচ কাজের দাবিতে রাজ্য উত্তাল। ছাত্র, যুবরা কোচবিহার থেকে কলকাতা যে ইনসাফ যাত্রা করেছেন, তারও প্রধান দাবি ছিল কাজ। ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআই’র বিরাট সমাবেশ থেকেও কাজের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন

● দশম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সমিতি সম্মেলন সমিতি সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (W.B.M.O.A)-এর ৮১তম রাজ্য সম্মেলন গত ১৩-১৪ জানুয়ারি ২০২৪ নদীয়া জেলার ঐতিহাসিক কৃষ্ণনগর শহরে সংগঠিত হয়েছে। সম্মেলন শুরুর পূর্বে ১২ জানুয়ারি উপস্থিত ও নদীয়া জেলার কর্মচারীদের এক সুবিশাল, বর্নাঢ্য ও সুদৃশ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিল উদ্বোধন করেন জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব শংকর ব্যানার্জী। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিকে ভেদ করার লক্ষে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে কমরেড শম্ভুনাথ চক্রবর্তী ও কমরেড রতন ভাস্কর নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। এই বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন পরবর্তীতে কর্মচারী আন্দোলনের কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গ এই বিষয়ে একটি আলোচনা সভা সংগঠিত হয়েছে। আলোচনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। পরবর্তীতে জেলার কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

সম্মেলন শুরুর পূর্বে সমিতির রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি শেখ আখতার আলি। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ডঃ শান্তনু ঝা, উদ্বোধক দেবব্রত রায়, সমিতির সাধারণ সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত সহ উপস্থিত নেতৃত্বরা শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। সম্মেলন উপলক্ষে কৃষ্ণনগর শহরের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড সমীর ভট্টাচার্য ও কমরেড অশোক সেনগুপ্তের নামে এবং সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড দেবব্রত বসাকের নামে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিশেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়।

এছাড়াও উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ডঃ শান্তনু ঝা। বক্তব্য রেখেছেন জেলার ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক, অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক কাজল কুমার দে।

সম্মেলনে খসড়া প্রতিবেদন উত্থাপন করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক অরূপ চন্দ, আয়-ব্যায়ের হিসেব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ দীপক রায়। ১২টি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন অন্যতম সংগঠন সম্পাদক গৌরাঙ্গ দাস এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক প্রণব কুমার কর। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন অন্যতম সংগঠন সম্পাদক গৌতম চক্রবর্তী এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ঝিমলী দিগপতি। "যৌথ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা'' এই বিষয়ে একটি পৃথক প্রস্তাব উত্থাপন করেন অন্যতম সংগঠন সম্পাদক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির নেতৃত্ব ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক দেবলা মুখার্জী। আগামী কর্মসূচী উত্থাপন করেন সমন্বয় পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মনোজ রক্ষিত।

সম্মেলনে প্রয়াত কমরেড সমীর ভট্টাচার্য ও কমরেড অশোক সেনগুপ্তের স্মারক বক্তৃতা দেন পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মানীয় অলোকেশ দাস। বিষয়ঃ 'ধর্মের রাজনীতিকরণ ও রাজনীতির ধর্মীয়করণ'। দেশের ও রাজ্যের শাসকদল কিভাবে রাজনীতিতে ধর্মকে মিশিয়ে সামাজিক পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলছে তিনি তা তুলে ধরেন।

সম্মেলনে দুটি বিষয়ে প্যানেল আলোচনা হয়েছে। মুখপত্রকে জনপ্রিয় করতে আমাদের ভূমিকা এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ এই দুটো ছিল আলোচনার বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের প্যানেল আলোচনা পরিচালনা করেন মূলত চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা এবং জেলা ও অঞ্চল থেকে বেশির ভাগ চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা বক্তব্য রাখেন। দুটো প্যানেল আলোচনাতে জেলা ও অঞ্চল থেকে বক্তারা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

সম্মেলনের মূল মঞ্চে ৯ জন মহিলা সহ মোট ৫১ জন আলোচনা করেন। মূল মঞ্চের আলোচনা এবং প্যানেল আলোচনার বিষয়বস্তুকে গুটিয়ে জবাবী ভাষণ দেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত।

সম্মেলন থেকে শেখ আখতার আলিকে সভাপতি, অরূপ চন্দকে সাধারণ সম্পাদক এবং দীপক রায়কে কোষাধ্যক্ষ করে মোট ৩০ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও ১৩০ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছে আগামী দু'বছরের জন্য। □

প্রয়াত কমরেড সত্যেন ব্যানার্জী

অবিভক্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রবীন কর্মচারী আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা সত্যেন ব্যানার্জি প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৮৯ বৎসর। গত ১৬/২/২৪ শুক্রবার ভোরে ই-এম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারী হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন। ১৯৫৪ সালে আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসকের দপ্তরে করণিক পদে তিনি সরকারী কর্মচারী হিসাবে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে এখান থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী (W.B.M.O.A) আন্দোলনের দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। অবসরের পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি পেনশনার্স সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। প্রয়াত সত্যেন ব্যানার্জির মরদেহ ভবানীপুরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হলে সেখানে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা, পেনশনার্স সমিতি ও বিশিষ্টজনের নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তিনি মরণোত্তর দেহদানে অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই অনুযায়ী কলকাতা চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মরদেহ চিকিৎসকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা-জামাতা বর্তমান। □

সুকান্ত চৌধুরী

নবম পৃষ্ঠার পরে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বা কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা এখনো নিদারুণভাবে বর্তমান। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার দিন হচ্ছে নারী দিবস। আবার দেশে যখন জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা বলে তাদের টার্গেট করা হয় তখন 'উজালা প্রকল্প' এতটুকু উজ্জ্বলতা দিতে পারে না গরবি মহিলাদের জীবনে। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'কে বলা হয় ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট, অথচ প্রকৃত অর্থে বাজেটে সে সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারিত হয় না। আই সি ডি এস প্রকল্প, যা প্রান্তিক মা ও শিশুর পুষ্টির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প। 'পরিবর্তনের প্রতিভূ' বলেন 'মোদি' মেয়েদের, অথচ 'মোদি গ্যারান্টি'তে বাদ পড়ে যায় এই প্রকল্পের সমস্ত দাবি দাওয়া, বরং এক কোটি টাকা কম বরাদ্দ হয় এই বাজেটে। অতএব নারী দিবসে এ নিয়ে তো প্রশ্ন উঠবেই, আন্দোলন হবেই।

দেশজুড়ে নারী নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা প্রতিদিন বাড়ছে। থম্পসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন বলছে ভারত মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। আজ শুধু হাথরস, উন্নাও না রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্র একের পর এক ধর্ষিতা হচ্ছেন মেয়েরা। মনিপুর আজও জ্বলছে। মনিপুরের বাতাসে এখনো বারুদের গন্ধ, নৃশংসতার চিহ্ন সর্বত্র। হারিয়ে গেছে এই সুন্দর রাজ্যের সব শান্তি, উধাও হয়ে গেছে গণতন্ত্র। অথচ মনিপুরে চলছে তথাকথিত 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার। কুকি ও মেইতি সম্প্রদায়কে শেষ করতে শয়ে শয়ে মানুষ মারছে সেনাবাহিনী, তার সাথে চলছে মহিলাদের উপর আদিম বর্বরতার অত্যাচার। বিবস্ত্র করে দুই কুকি মহিলাকে নির্যাতনের ভাইরাল ছবি সবার নিশ্চয় মনে আছে, মহিলাদের বিবস্ত্র করে প্যারেড করানো বিশ্বের কাছে দেশ কলঙ্কিত হয়েছে। তারপর মহিলা কুস্তিগীরদের হয়রানি। এরপরেও প্রধানমন্ত্রী একবারের জন্যেও মনিপুরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি, অথবা বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিং সারণের প্রতি কোনোরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি দেশের শাসকদল। বোঝা যায় মনুবাদ এই শাসকদলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দেশের শাসকদলের নীতিই হচ্ছে মহিলাদের ধর্মীয় কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা। তাদের মহিলারা শুধু সন্তান উৎপাদন ও ঘরকন্নার কাজই করবে। এই মনুবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার অন্যতম দিন ৮ মার্চ, নারী দিবস। আবার বিজেপি যে কিরকম ভারত গড়তে চাইছে তা বোঝা যায় যখন প্রধানমন্ত্রী 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' পালন করে লালকেল্লায় বড় বড় ভাষণ দেন, ঠিক তারপরেই বিলকিসবানোর ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়া হয়, বিলকিসবানোর হয়ে লড়াই করা তিস্তা শীতলাবাদকে হয়রানি করা হয়। হাথরসের দলিত কন্যার উচ্চবর্ণের ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

দেশের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথেই মিশে গেছে নারী দিবসে রাজ্যের মেয়েদের লড়াই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। 'শ্রী' মার্কা প্রকল্প ঘোষণা করতে করতে রাজ্যটাই যে হতশ্রী হয়ে যাচ্ছে, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সেদিকে কোনো হুঁস নেই। একের পর এক বিজ্ঞাপনের (সরকারী টাকায়) ঝলকানিতে প্রকল্প ঘোষণা করা মুখ্যমন্ত্রী, হাঁসখালির ধর্ষণের ঘটনার পর নিজে কেস সাজিয়ে দিতে ব্যস্ত থাকেন, মুখে বডি শেমিং করেন ধর্ষিতার, এ কোন্ সভ্যতায় আছি আমরা? যখন সারা দেশ কলঙ্কিত হচ্ছে মণিপুরে জাতিদাঙ্গায় বিবস্ত্র মহিলাদের অত্যাচার নিয়ে, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ পুড়িয়ে মালদায় মহিলাকে বিবস্ত্র করার ঘটনা ঘটে। রাজ্যে আট থেকে আশি কেউ নিরাপদ নয়। পার্কস্ট্রীটের সুজেট থেকে, রায়গঞ্জের কিশোরী, রানাঘাটের সন্ন্যাসিনী থেকে কালিয়াগঞ্জের তরুণীর ধর্ষণ বা মৃত্যুর পরেও রাজ্যের আইনের শাসনকে দরাজ সার্টিফিকেট দেন মাননীয়া নিজে। কারাগারে মহিলা কয়েদীদের অন্তসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা সরকারের ব্যর্থতার অন্যতম নজির। এমনকি প্রতিবন্ধী মহিলারাও বাদ যাচ্ছে না ধর্ষণের হাত থেকে। এর সাথে বীভৎসতম সংযোজন হচ্ছে সন্দেশখালি, যা সভ্যজগতে নজিরবিহীন। সন্দেশখালির মহিলাদের উপর দীর্ঘ আট-দশ বছর ধরে অত্যাচারের ঘটনা মনে করিয়ে দেয় নীলকর সাহেবদের কথা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মহিলারাও যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা দেখিয়ে দিল ওখানের মহিলারা। ঐ সাহসী প্রতিবাদী মহিলাদের কুর্ণিস জানানোর দিন হচ্ছে নারী দিবস। সাথে শেখ শাহজাহান, উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের লুটের রাজত্ব শেষ করার অঙ্গীকার করার দিন হচ্ছে ৮ মার্চ, নারী দিবস। রাজ্যের অভ্যন্তরে এরকম সন্দেশখালি আরো অনেক আছে, যা প্রকাশ্যে আসতে দিচ্ছে না রাজ্যের পোষা পুলিশ। কিন্তু সন্দেশখালির মহিলারা সারা রাজ্যের মহিলাদের উৎসাহিত করবে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা বাংলা তথা রাজ্যকে। সন্দেশখালির এই নির্যাতিতা নারীরা এত বছর ধরে চলা তাদের উপর অত্যাচারের কথা রাষ্ট্রপতির কাছেও বলার সাহস দেখিয়েছে। এইরকম সাহসী প্রতিবাদী মহিলাদের জন্য গর্ববোধ করি এবং নারী জাতির প্রতি সামান্যতম মর্যাদা হানিকর, অসম্মান বা কুৎসিত নির্যাতন হলে নারী সমাজ তো অবশ্যই সমগ্র সমাজের কাছে সেটা লজ্জার ও ঘৃণার হওয়া উচিত। কিন্তু ভাবতে লজ্জা বা ঘৃণা হয় যখন নারী জাতির অপর একটি অংশ এত নক্কারজনক ঘটনার পরেও শুধু নির্বিকার থাকে তা নয়, সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে কোনো প্রতিবাদও করে না, বরং আনন্দ পায়। মাননীয়া ও তার মহিলা মন্ত্রীরা এত কুৎসিত নির্যাতনের ঘটনাকেও ছোটো ঘটনা বা মিথ্যা রটনা বলে ঢাকা দেয়, সত্যিই তাদের প্রতি ঘৃণাই হয়। তাই আন্তর্জাতিক নারী দিবস এদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ নেওয়ার দিন, তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করার দিন। শুধু শপথ নেওয়াই নয়, আগামী সমস্ত লড়াই সংগ্রামে এদের বিরুদ্ধে কী দেশ, কী রাজ্য তাদের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার দিন এসেছে। তাই নিজেদের মতাদর্শে অবিচল থেকে দেশ ও রাজ্যে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আগামী রাজনৈতিক সংগ্রামে আমাদের উপযুক্ত জবাব দিতেই হবে। □

নবম পৃষ্ঠার পরে

কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেট

মানুষ। সেই কাজ প্রশ্নেই কোনও দিশা মমতা ব্যানার্জির বাজেটে নেই।

গত বারো বছরে বারবার সরকারি দপ্তরে এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলিতে শুন্য পদে নিয়োগের দাবি করে এসেছে বাম সংগঠনগুলি। সম্প্রতি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে ২৩ দিন ব্যাপী পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত যে 'অধিকার যাত্রা' সম্পন্ন হয়েছে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে, তারও অন্যতম প্রধান দাবি ছিল শুন্য পদে সুষ্ঠু নিয়োগ। রাজ্য সরকার তেমন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। পুলিশে কিছু নিয়োগ ছাড়া গত বারো বছরে রাজ্য সরকারে স্থায়ী নিয়োগ হয়নি। এখন লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই সব শুন্য পদ পূরণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি।

মমতা ব্যানার্জি প্রতিবছর বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন করেন। সর্বশেষ বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন হয়েছে গত নভেম্বরে। তার আগে ৬টি এই ধরনের সম্মেলন রাজ্যে করেছে তৃণমূল সরকার। গত নভেম্বরের ৭ম সম্মেলনে রাজ্য সরকারের দাবি, বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল ৩,৭৬,২৮৮ কোটি টাকার। তার আগের সম্মেলনগুলি পর্যন্ত ঘোষিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৩,৭২, ৩২৯ কোটি ২ লক্ষ টাকার। শেষ পর্যন্ত কতগুলি শিল্প হয়েছে? বাজেটে একটি লাইনও নেই। তাতে কত মানুষের কাজ হয়েছে? বাজেটে একটি লাইনও লেখা হয়নি।

অবশ্য শুধুই গ্রামাঞ্চলের নয়, রাজ্যের যে কোনও দিকেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে ব্যার্থ এই সরকার। ঠিক কেন্দ্রীয় সরকারেরই মতো এখানকার সরকারও প্রায় সর্বাংশের মানুষের রুজির বিনিময়ে মুষ্টিমেয়র সেবা করতে সদাই ব্যাস্ত। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে দেয় টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিতে কোনওরকম লাগাম পরাতে ব্যার্থ হওয়ায় (অথবা প্রকৃতপক্ষে অনীহা থাকায়) সেই টাকা কোনও কাজে আসবে না বলেই বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই ধরনের প্রকল্প দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই বর্তমান এবং অনেক রাজ্যেই এর থেকে বেশি পরিমাণ টাকা মহিলাদের দেওয়া হয়ে থাকে।

সামনে ভোট, তাই বাজেটে ফুলঝুরির মতো প্রতিশ্রুতি বিলিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুদান থেকে কাজের সুযোগ বৃদ্ধির অনেক ঘোষণাই করা হয়েছে, কিন্তু রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কোনও পদক্ষেপ না থাকায় এই বাজেটেও আয়ের কোনও বন্দোবস্ত নেই, ফলে প্রতিশ্রুতি বাস্তবের মুখ কোনও দিনই দেখবে না—এটা বলাই বাহুল্য। সরকার নিজেও জানে সেটা। তাই বাজেটের প্রতিটি ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতে যে আর্থিক সংস্থান রাখতে হয় এবং রাজস্ব আদায়ে তার সংস্থান রাখতে হয়, তার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি বাজেটে, এমনকি বেশ কিছু প্রকল্পের ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতে কত অর্থ বরাদ্দ করা হবে, তার কোনও উল্লেখই করা হয়নি এতে।

রাজ্য সরকার মোট ৩,৬৬,০০০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে, যার মধ্যে ধরে নেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রর কাছ থেকে আসবে ১,২৭,০০০ কোটি টাকা করের ভাগ এবং অনুদান বাবদ। রাজ্য সরকারের নিজস্ব কর সংগ্রহ ধরা আছে ১,১৪,০০০ কোটি টাকার (যার মধ্যে ২২, ০০০ কোটি টাকাই নাকি আসবে মদ বিক্রি করে) আর ঋণ খাতে আসবে ৯২,০০০ কোটি টাকা।

আয়ের পর খরচ কিভাবে হবে, সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ দিশাহীন সরকার। কল্যাণ খাতে যে সমস্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তাতে আর যাই হোক 'কল্যাণ' চলতে পারে না। যেমন রাজ্যে পিপিপি মডেলে নতুন চারটে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছে বাজেটে, কিন্তু তার জন্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ১০০ কোটি টাকা। এমন ব্যবস্থায় কবে রাজ্যে বিদ্যুৎ আসবে, বা আদৌ আসবে না, তা সহজেই অনুমেয়। এমন উদাহরণ বাজেটে ভুরিভুরি। গোটা বাজেট জুড়ে আছে কেবল 'হাজার হাজার', 'লক্ষ লক্ষ', 'কোটি কোটি'র মতো 'গোল গোল' কিছু কথা। সুতরাং আগামী দিনে রাজ্য সরকার যে শুধুমাত্র মেলা, খেলা, মদ আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মজিয়ে রেখে রাজ্যের জনগণ তথা যুবসমাজের ভবিষ্যতকে গোল্লায় পাঠানো ছাড়া আর কিছুই করতে চাইছে না, সেকথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। ভালো কিছু করা এই সরকারের ধাতে নেই। সুতরাং "সাধু সাবধান''!! □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

পাহাড় থেকে সাগর অধিকার যাত্রা

প্রথম দিন ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শনিবার যাত্রা শুরু নাতিদীর্ঘ পদযাত্রা করে সিতাই ব্লক অফিসের সামনে থেকে কোচবিহারের দিনহাটা ব্লক এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। পথিমধ্যে ছোলা মুড়িবাদাম বাতাসা হালকা টিফিন আর প্রচুর জল। কোচবিহার কর্মচারী ভবনে রাত্রি যাপন রাখা হয় ঐদিন।

দ্বিতীয় দিন ১৮ই ফেব্রুয়ারি রবিবার সকাল সকাল পদযাত্রা শুরু খাগড়াবাড়ি মোড়, বানেশ্বর এ পথসভা করে আলিপুরদুয়ার জেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা। এরই মাঝখানে কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার হাতে জাতীয় পতাকা হস্তান্তর হয়, হস্তান্তরিত হই আমরা অধিকার যাত্রীরাও। আলিপুরদুয়ারে ক্লাউড লাইন-এ আহারের পরে পদযাত্রা শুরু হয় কামাখ্যাগুড়ির উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যাপক উপস্থিতি ঘটে সরকারী কর্মরত কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের। মানুষের জমায়েত, মানুষের আবেগ পুষ্পবৃষ্টি আমরা কি সত্যিই এর যোগ্য? নিজেদের মনে প্রশ্ন জাগে। রাত্রে ওই ক্লাউড লাইন রাত্রি বাস।

তৃতীয় দিন ১৯ শে ফেব্রুয়ারি সোমবার সকালবেলায় ডুয়ার্স কন্যার সামনে রাস্তা কাঁপিয়ে পদযাত্রা চলে আলিপুরদুয়ার শহরকে নাড়িয়ে দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার উদ্দেশ্যে। ফালাকাটা, ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি জেলায় সমস্ত পদযাত্রীদের দেওয়া হয় সাদা লাল ট্রাকসুট অল্পবিস্তর ঠান্ডার মধ্যে যথেষ্ট আরামদায়ক। অল্প সময় বিশ্রাম নিয়ে দুপুরে আহার করে পদযাত্রা শুরু হয় বানারহাটের উদ্দেশ্যে। বানারহাট হয়ে পদযাত্রা এগিয়ে চলে চালসার দিকে। চালশা চৌমাথায় সভা করে গরম চা ও সিঙ্গারা সহযোগে টিফিন করে রাত্রিবেলায় পৌঁছায় মাল বাজারে। আজকে তৃতীয় রাত মালবাজারে মোট তিনটি জায়গায় আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চতুর্থ দিন ২০ শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার মালবাজার থেকে গরুবাথানের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া। গরু বাথানে তিন জায়গায় সভা করা হয় পুরোটাই পদযাত্রা। মূলত নেপালিও গোর্খা জনজাতির বসবাস মাল ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। এখানে চা বাগিচা শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য সরকারী অফিসগুলোতেও কর্মচারীরাও বেরিয়ে এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রচুর লিফলেট তাদের মধ্যে দেয়া হয়। কিন্তু ভাষা ছিল আমাদের অন্তরায়। মূলত হিন্দি ও দু'একজন নেপালি ভাষাতেও কথাবার্তা বলেন। চা বাগিচা শ্রমিকরা মূলত মহিলা আমাদের জন্য উপহার হিসেবে নিয়েছিলেন চা পাতা। ক্রান্তি ব্লক হয়ে ময়নাগুড়ি চা বস্তিতে সভা ও পদযাত্রা করে অধিকার যাত্রা পৌঁছায় জলপাইগুড়ি সদর জেলাশাসকের অফিসের সামনে এক বর্নাঢ্য মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। স্বল্পসময়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন আমরা কোনো ডেপুটেশন দিতে আসিনি, সরকারকে জানিয়ে দিতে এসেছি আমাদের দাবি দাওয়া। দার্জিলিং মোড় হয়ে অধিকার যাত্রা পৌঁছায় সফদার হাসমি চকে। চতুর্থ দিন রাত্রি বাস দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি কর্মচারী ভবনে স্থায়ী পদযাত্রি বিভিন্ন কারণে কিছু কমে গেলেও আমরা রয়ে গেছি অনেকেই।

পঞ্চম দিন ২১ ফেব্রুয়ারি বুধবার "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি?'' ভাষা শহীদ দিবস। যথাবিহিত ভাবে বাঘাযতীন পার্কে শহীদ স্মারকে পুষ্প স্তবক দিয়ে শুরু হল আজকের অধিকার যাত্রা। যত বেলা বাড়ে অধিকার যাত্রায় কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সঙ্গে ভিড় বারে সাধারণ মানুষের। কারণ দাবি-দাওয়া সবারই এক। রক্ত পতাকা নিয়ে সারিবদ্ধভাবে সর্পীল এই মিছিল দখল নেয় পাহাড়ের পাদদেশের এই শহরকে। জলপাই মোড় হিলকার্ট রোড হয়ে পদযাত্রা পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়ায়। ক্ষণিকের সভা বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চলে খড়িবাড়ি অল্প উঁচু নিচু ভূমি অঞ্চলের খেটে খাওয়া মূলত কৃষিজীবী মানুষ ও চা বাগিচা শ্রমিকদের নিত্য নতুন দাবি-দাওয়া নিয়ে আমাদের সঙ্গে অনেকটা পথ হেঁটে চলা। অসংখ্য মানুষের আলিঙ্গন সারা জীবনের পাওয়া। আবার পথ চলা কিছুটা পায়ে হেঁটে কিছুটা বাসে খড়িবাড়ি থেকে বিধান নগর ঘোষপুকুর বাইপাস হয়ে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া আবার পতাকা হস্তান্তর দার্জিলিং জেলা থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলা আবার পথ চলা ইসলামপুরের উদ্দেশ্যে। ইসলামপুরে ছাত্র যুবদের সে যে কি উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা আমাদের থেকেও মিছিলে তাদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। রাত হয়ে গেছে পায়ে হাঁটা বন্ধ হয়নি। রাত্রি যাপন ইসলামপুরে।

ষষ্ঠ দিন ২২ শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার অনেক বর্ষীয়ান অবসরপ্রাপ্ত নেতৃত্ব আজকে রাস্তায়, একইসঙ্গে কর্মরত কর্মচারীরাও আমাদের সঙ্গে অধিকার যাত্রায়, এগিয়ে চলা রায়গঞ্জ শহরের উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে গোয়ালপোখোর, দাড়িভিট-এর মতো উপদ্রুত অঞ্চল পার হয়ে চাকুলিয়া, করণদিঘি, রায়গঞ্জ হয়ে কর্ণজোড়া, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ফতেপুর। পথিমধ্যে কত মানুষের কত রকম প্রশ্ন "ই কিমন লাল পতাইকা যুতে কোনো চিহ্ন লাই?'' সত্যিই তো আমরা যে লাল পতাকা বহন করি তাতে তো চিহ্ন থাকতে পারে না তাই বোঝাতে হল সাধারণ মানুষকে। আমরা কারা রক্ত পতাকাধারি আমাদের বক্তব্য কী? কেন আমরা আজ সরকারী কর্মচারীরা রাজপথে নেমেছি? ষষ্ঠ দিন রাত্রি যাপন বালুরঘাট শহরে।

সপ্তম দিন ২৩ শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালবেলায় মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় আমরা কোনো মাইক ব্যবহার করতে পারিনি আমাদের সম্বল ছিল হাত মাইক, কিন্তু গলার জোর ছিল অনেক। সুদুর বাংলাদেশ সংলগ্ন তপন ব্লক, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর হয়ে মেহেদীপুর প্রায় রাত্রি হস্তান্তরিত হল মালদা জেলার হাতে গাঁজোলে। অভূতপূর্ব জমায়েত ছোট গঞ্জ গাঁজোলে হাতে হাতে জ্বলছে মশাল। যেন এক মশাল মিছিল চলেছে মালদা সদরের দিকে, মালদার ঘড়ি মোড়ে সভা করে রাত যাপন মালদা কর্মচারী ভবনে।

অষ্টম দিন ২৪ শে ফেব্রুয়ারি শনিবার মালদা কর্মচারী ভবন থেকে সুজাপুর-কালিয়াগঞ্জ হয়ে ফারাক্কায় গঙ্গা পার হয়ে অধিকারযাত্রা পৌঁছালো, দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায়। অভূতপূর্ব আয়োজন মালদা মুর্শিদাবাদের কর্মচারীদের জমায়েত বরণ করলেন অধিকার যাত্রীদের। মুর্শিদাবাদ জেলায় রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা, লালবাগ হয়ে অধিকার যাত্রীরা পৌঁছালেন বহরমপুর। রাত হয়ে গেছে বহরমপুর শহরে সরকারী কর্মচারীদের অভূতপূর্ব সমাবেশের মধ্যেও অত রাতেও পথ সভাটি সমাপ্ত হল আজকের রাত্রি বাস বহরমপুর শহরের কর্মচারী ভবনে।

নবম দিন ২৫ শে ফেব্রুয়ারি রবিবার সকালে তাড়াতাড়ি করে বেরোনো হল আজকে পথ অনেক বাহাদুরপুর যেতে হবে গোকর্ণ, কান্দি, খরগ্রামের নগর হয়ে পরিসমাপ্তি মোড়গ্রাম এ, বীরভূম জেলার হাতে অধিকার যাত্রা হস্তান্তরিত হল। মোরগ্রাম মোড় থেকে লোহাপুর প্রায় অন্ধকার বিকেলবেলায় ছাত্র যুব কৃষক সভার সমাবেশ এক অভূতপূর্ব সভায় পরিণত হয়। কত বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েছাত্র যুব সংগঠনের এই সমাবেশে উপস্থিত ছিল যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় রাত আটটায় নলহাটি হয়ে রামপুরহাট ঘড়িঘর পৌঁছোতে অনেক রাত হয়ে যায়। তাও অনেক মানুষের জমায়েত। রাত্রি যাপন রামপুরহাট।

দশম দিন ২৬ শে ফেব্রুয়ারি সোমবার রামপুরহাট থেকে তারাপীঠ স্টেশন রোড পদযাত্রা এগিয়ে চলেছে বাইনা, মল্লারপুর, দেউচাপাচামী হয়ে মহম্মদবাজার। দেউচাপাচামিতে জমিহারা উদ্বাস্তু মানুষজন না পেয়েছে চাকরি, না পেয়েছে ক্ষতিপূরণ, না পেয়েছে পুনর্বাসন। আর যারা পেয়েছে তার অনেকটাই চলে গেছে শাসকদলের নেতাদের পকেটে। উপস্থিত অভাবী মানুষদের প্রশ্ন ভাবিত করে দেয় আমাদের। সিউড়ির পথে অতি দীর্ঘ অধিকার যাত্রা সিউড়ি শহরে ও বাসস্ট্যান্ডে দুটি সভা করে রাত্রিযাপন লীস ক্লাবে।

একাদশতম দিন সাতাশে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার অধিকারযাত্রা এগিয়ে চলে পুরন্দরপুর, সাঁইথিয়া বিডিও অফিস, বোলপুর, শ্রীনিকেতন হয়ে ভেদিয়ার পথে। কত মানুষ কত উৎসাহ নিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ডালি ভরা ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন পৌঁছাবে অধিকার যাত্রা, শুনবে তাদের অভাব অভিযোগ। ভেদিয়া মোড়ে বোলপুর থেকে পূর্ব বর্ধমানে প্রবেশ করে অধিকারযাত্রা। শাঁখে ফু দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় এই বিশাল মিছিলকে। মিছিল এগিয়ে চলে গুসকরা হয়ে কাটোয়ার দিকে। কাটোয়া ময়দানে এক বিরাট সভা করে 'অধিকার যাত্রা' পৌঁছায় ভাতার অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের সামনে। কার্জন গেটে রাত প্রায় পৌনে দশটা, তখনো কর্মচারী উপস্থিত। রাতে যাপন পূর্ব বর্ধমান কর্মচারী ভবনে।

দ্বাদশতম দিন ২৮শে ফেব্রুয়ারি বুধবার আসানসোলের পথে 'অধিকার যাত্রা' এগিয়ে চলে গোলসি, বুদবুদ হয়ে। কাঁকসায় জেলা পরিবর্তন হয় পশ্চিম বর্ধমানের হাতে গন্তব্য রানীগঞ্জ, পানাগড়, হয়ে আসানসোলের দিশেরঘাট। কাঁকসায় কৃষক সভার উদ্যোগে এক বিরাট সভা বিডিও অফিসের সামনে শুরু হওয়া মাত্রই বিডিও ডানদিকের রাস্তা ধরে এবং সভাপতি বামদিকের রাস্তা ধরে একরকম প্রায় পালিয়েই গেলেন। আসানসোল সদরে কোর্টমুখী রাস্তা ধরে জনস্রোত এগিয়ে যায় জেলা সদর দপ্তরের সামনে। দশেরঘাটে পশ্চিম বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া জেলার হাতে 'অধিকার যাত্রা' অর্পণ হওয়ার পর শালতোড়া, ছাতনা হয়ে বাঁকুড়া সদরের দিকে অনেক রাত প্রায় পৌনে দশটা শহরের সভা সেরে অধিকার যাত্রা পৌঁছায় বিষ্ণুপুর সদরে রাত প্রায় বারোটা। অবসরপ্রাপ্ত মানুষজন তখনও অপেক্ষায় আমাদের। রাত্রিযাপন বিষ্ণুপুর বাসস্ট্যান্ডের অতিথিশালায়।

ত্রয়োদশতম দিন ২৯ শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালবেলায় যাত্রা শুরু একদা সন্ত্রাস কবলিত তালডাংরা, সিমলাপাল, খাতরা, ইন্দপুর হয়ে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর। রাঢ়ভূমির অঞ্চল কয়লা খাদান মূলত শ্রমজীবী মানুষের বসবাস সমস্যা জর্জরিত অনুন্নত জেলা পুরুলিয়ায়। রাত্রি বাস রঘুনাথপুর।

চতুর্দশতম দিন ১লা মার্চ শুক্রবার অধিকার যাত্রার পদযাত্রীরা এগিয়ে চলেন আনারা, ঝাপড়া, কুস্তোয়ার হয়ে গোলকুন্ডা। রাত্রিযাপন পুরুলিয়া সদর।

পঞ্চদশতম দিন ২ মার্চ শনিবার এখনো পলাশে ফোটেনি ফুল শিমুলের রাঙা চারিদিকে লাল অধিকার যাত্রা এগিয়ে চলে পাথর খাদান, কয়লা খাদান সম্মিলিত অঞ্চল কেন্দা। বিন্দা মোরে আদিবাসী নৃত্য সহ প্রচুর স্থানীয় আদিবাসী মানুষের ভিড় তার মধ্যে দিয়ে অধিকার যাত্রা এগিয়ে চলে। বান্দোয়ান এক দিকে পড়ে থাকে দূরে অযোধ্যা পাহাড় আরেকদিকে বরন্তি লেকের মুরাডিহি হয়ে বাঁশপাহাড়ির দিকে। জঙ্গলমহলের অন্যতম সন্ত্রাস কবলিত অঞ্চল বাঁশ পাহাড়িতে পুরুলিয়া থেকে ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রবেশ করে অধিকার যাত্রা। ঘন জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে গরিব খেটে খাওয়া মানুষের অভূতপূর্ব সমাবেশ স্কুল-কলেজের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হাতে বানানো ফুলের স্তবক নিয়ে বাড়ির, পুজো দেওয়ার শাঁখ বাজিয়ে বরণ করেন আমাদের। বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন অভুক্ত পেটে অসক্ত শরীরে শুধুমাত্র আমাদের উপস্থিতির জন্য। বড় খেদ হয়, ক্লেশ হয়, কী করতে পারব এদের জন্য আমরা? অথচ লাল পতাকার জন্য তাদের মমত্ববোধ কুরে কুরে খায় আমাদের। মাওবাদী নামে কিছু সমাজবিরোধী শুধুমাত্র শান্ত পশ্চিমবাংলার ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য ওই জঙ্গলমহলের লাল মাটির অঞ্চলকে সন্ত্রাস কবলিত করে রেখেছিল। ভুলি নাই বাঁশপাহাড়ি, ভোলাবেদা, বেলপাহাড়ি, বিনপুর ১, বিনপুর ২,ধামসা অঞ্চলগুলোকে। স্কুলের মাস্টারকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে বুলেট বিদ্ধ করে দেওয়া ছবি। আমরা ভুলিনি থানা থেকে পুলিশ আধিকারিককে তুলে নিয়ে যাওয়া, আমরা ভুলিনি রক্তাক্ত জঙ্গলমহলে মাওবাদী নেতার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা। আজ প্রমাণিত এরা সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। রাত্রিযাপন ঝাড়গ্রাম-এর অগ্রসেন ভবনে।

ষোড়শতম দিন ৩ মার্চ রবিবার। পদযাত্রীরা এগিয়ে চলেন ঝাড়গ্রাম শহর হয়ে বৈইতা, ধেঁরুয়ার দিকে। অধিকার যাত্রার মধ্যেই হঠাৎ নজরে আসে সেই গতকালকে দেখা গভীর জঙ্গলের মধ্যে হাতে লেখা পোস্টার হাতে এস এফ আই এর ছাত্র-ছাত্রীদের জোট। কিঞ্চিত লাজুক ভাবে লম্বা কাগজে হাতে লেখা পোস্টারটি খুলতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। মেলে ধরতে বলাতে উৎসাহ নিয়ে বড় ব্যানারের পেছন পেছন বুক চিতিয়ে চলতে থাকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। ধেঁরুয়ায় সমর্পিত হয়, পশ্চিম মেদিনীপুরের হাতে। রাত্রিযাপন পশ্চিম মেদিনীপুর কর্মচারী ভবনে।

সপ্তদশতম দিন ৪ঠা মার্চ সোমবার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কর্মরত কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তরা বিশাল পদযাত্রাকে এক সুবিশাল মিছিলে পরিণত করে। ক্রমশ এগিয়ে চলে কমলা কেবিন, ইন্দা মোর, হয়ে এগরা বাসস্ট্যান্ডের দিকে। পথিমধ্যেই হাত বদল পূর্ব মেদিনীপুর এর কাছে। রাতে এগরা বাসস্ট্যান্ডে দীঘা বাসস্ট্যান্ডে বালিঘাই হয়ে কাঁথিতে বিশাল পথসভা আজকে এখানেই রাত্রি যাপন।

অষ্টাদশতম দিন ৫ই মার্চ মঙ্গলবার কর্মরতদের কর্মচঞ্চল দিন তাও বিশাল অধিকার যাত্রা এগিয়ে চলে কাঁথি রূপসী বাংলা বাস স্ট্যান্ড থেকে মারিশদা, নাচিন্দা, হাঁড়িয়া, নিমতৌড়ি, মানিকতলা হয়ে তমলুকের পথে। প্রচন্ড গরমে অত্যন্ত রোদের মধ্যেও তমলুক সদরে সরকারী কর্মচারীরা যেভাবে ভিড় জমিয়েছিলেন তা অভূতপূর্ব। তমলুক থেকে রূপনারায়ণ পার হয়ে কোলাঘাটে অপর পাড়ে হাত বদল হয় হাওড়া জেলার হাতে। অধিকার যাত্রা এগিয়ে চলে উলুবেড়িয়া শহরের দিকে। সু বিশাল জনপ্লাবন নিয়ে উলুবেড়িয়া স্টেশন রোড অতিক্রম করে উলুবেড়িয়া সদর কার্যালয়ের বিপরীতে সংকীর্ণ রাস্তায় হয় বিরাট জনসভা রাত প্রায় নটা। রাত্রিযাপন উলুবেড়িয়ায়।

উনবিংশতিতম দিন ৬ মার্চ বুধবার আমতা হয়ে উদয়নারায়নপুর অধিকার যাত্রা এগিয়ে চলে হুগলির দিকে। হুগলির হাতে সমর্পিত হয়ে অধিকার যাত্রা এগিয়ে যায় পুরশুড়া, নালিকুল, সিঙ্গুর, বৈদ্যবাটি হয়ে চন্দননগরের পথে। সিঙ্গুর শহরে সব হারা মানুষের চোখের আকুল আর্তিপ্রকাশ করে দিচ্ছিল কিছুই না পাওয়ার বঞ্চনাকে। চন্দননগরে গঙ্গার তীরে রাত্রি যাপন।

বিংশতিতম দিন ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার অধিকার যাত্রা যত শেষের দিকে আসছে ততই বাড়ছে যাত্রীদের সংখ্যা। মিছিল আর মিছিল নেই, জনস্রোতে পরিণত হচ্ছে। চন্দননগর শহরের খাদিনা মোড়, ঘড়ি মোড় হয়ে মগরা, জিরাট থেকে কালনার দিকে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার দিকে বাকি থেকে যাওয়ায় আবার পূর্ব বর্ধমান কালনা বিডিও অফিসের সামনে সংক্ষিপ্ত সভা ও অধিকার যাত্রাকে স্মরণে রেখে বৃক্ষরোপণ। এই অনুষ্ঠানের পরে গৌরাঙ্গ সেতু হয়ে মিছিল এগিয়ে যায় কৃষ্ণনগরের দিকে হস্তান্তরিত হয় নদীয়া জেলার হাতে। কৃষ্ণনগর শহর থেকে পদযাত্রা এগিয়ে চলে চাপড়া, পলাশী পাড়া হয়ে পলাশীর দিকে প্রায় সন্ধ্যেবেলায়। চাপড়ায় উপস্থিত ছিল উল্লেখযোগ্য। পলাশী পাড়ায় আরো রাত। স্বল্প সময়ের পথসভা রাত প্রায় এগারোটা, পলাশীর গোটা রাস্তা জুড়ে মশাল মিছিল নিয়ে তখন অগুন্তি মানুষ আমাদের অপেক্ষায়। রাত্রিযাপন কৃষ্ণনগর শহরে নদীয়া কর্মচারী ভবনে।

একবিংশতিতম দিন ৮ মার্চ শুক্রবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আজকে পতাকা ধারনের দায়িত্ব শুধুমাত্র মহিলাদেরই হাতে অর্পণ করা হয়েছে। কৃষ্ণনগর সদর থেকে রানাঘাট, চাকদা, কল্যাণী সর্বত্র সুবিশাল অধিকার যাত্রা গরুহাটা ফাঁড়িতে হস্তান্তরিত হয় উত্তর ২৪ পরগনার হাতে। নৈহাটিতে পদযাত্রা সমাপ্ত হয় স্টেশন মাঠে হয় জনসভা। অধিকার যাত্রা এগিয়ে চলে ব্যারাকপুরের দিকে। বারাকপুর স্টেশনে সভাশেষে বারাসত পৌঁছে রাত্রি যাপন।

দ্বাবিংশতিতম দিন ৯ মার্চ শনিবার সকাল সকাল অধিকারযাত্রা রওনা দেয় বারাসত থেকে মধ্যমগ্রাম হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কামালগাজীর উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে মধ্যমগ্রামে এক বিরাট জনসভায় অধিকার যাত্রা হস্তান্তরিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাতে। রাত্রিযাপন ডায়মন্ড হারবারে।

ত্রয়োবিংশতিতম দিন ১০ মার্চ রবিবার অধিকার যাত্রার আজ সমাপ্তি। কুলপি, বিজয়গঞ্জ, সংগ্রামপুর হয়ে বারুইপুর পদযাত্রা শেষে দুপুরের আহারগ্রহণ করে আবার গড়িয়া থেকে অধিকার যাত্রা শহর কলকাতার বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে উপনীত হয় যাদবপুর ৮ বি বাসস্ট্যান্ডে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মূল ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক এবং ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব সৃজন ভট্টাচার্য। বর্ণাঢ্য সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত করা হয় আট জন স্থায়ী পদযাত্রীদের যারা দীর্ঘ ২৪ দিন ধরে বাড়িছাড়া হয়ে রয়েছেন ২৩ দিন ধরে হেঁটেছেন প্রায় সাড়ে ৬০০ কিলোমিটার পথ। অতিক্রম করেছেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার পথ। এই কদিন আমরা মোট আটটি জেলায় আমাদের নিজস্ব কর্মচারী ভবনে রাত্রি যাপন করেছি দশটি জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হল ভাড়া করা হয়েছিল সেখানে রাত্রি যাপন করেছি। আর পাঁচটা দিন 'লিজ ক্লাব' 'ক্লাউড লাইন'-এর মতো অঞ্চল এসব জায়গায় থেকেছি। এই কদিন সকলে মিলে একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে পথ চলা প্রতিদিনের সবাই তৈরি হয়ে যাওয়া সময় মতো এটাই ছিল আমাদের প্রাপ্তি। হয়তো সবাই প্রতিদিন থাকতে পারেননি, কিন্তু অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সমিতির যাকে যেখানে যতজন নিয়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল বা যুক্ত হতে বলা হয়েছিল অধিকাংশ জায়গায় সেই সংখ্যায় অথবা তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রতিটি জেলা তার সাধ্যমত যথেষ্ট করেছেন সে দুপুরের আহার কি রাত্রের আহার যে যেমন ভাবে পেরেছেন শুকনো টিফিন প্রচুর পরিমাণে জল আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এছাড়াও আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পথ চলতি অনেক মানুষ। বহু মানুষ, বহু বিকলাঙ্গ মানুষ হতদরিদ্র মানুষ পায়ে পা মিলিয়েছেন হেঁটেছেন দীর্ঘ পথ আমাদের সঙ্গে শুধুমাত্র আমাদের দাবিদাওয়াকে সমর্থন করে। কেউ কেউ হাতে বানানো পুষ্পস্তবক ভাঁট ফুল আর পাতাবাহারের পাতা দিয়ে বানানো অথবা পলাশ ফুল দিয়ে বানানো পুষ্পস্তবক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের হাতে তুলে দেবেন বলে। বহু মানুষ রাস্তার দুধার থেকে আশীর্বাদের মতো করেছেন পুষ্পবৃষ্টি, কোথাও পড়িয়েছেন ফুলের মালা, গলি গঞ্জ থেকে দৌড়ে এসেছেন শুধুমাত্র লাল পতাকার মিছিল দেখবার জন্য। মানুষ আর অন্য কোনো রং পছন্দ করেনা। সেই ভাবে বিরোধী শক্তি কেউ না থাকার দরুন মানুষ আরো বেশি করে লাল পতাকাটাকেই শক্ত করে ধরতে চাইছেন। একটু একটু করে ক্রমশ মানুষ বুঝতে পারছে কে আপন কে পর, কে মানুষের ভালো করে আর কারা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ক্রমবর্ধমান জিনিসপত্রর, ওষুধের, পরনের জামা কাপড়ে সমস্ত কিছুকে নিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি বস্তুর এই ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির কারণ কী। দেশের ও রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ মানুষকে মানুষের সঙ্গে জাত ধর্ম বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজিত করে রাখার প্রচেষ্টা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সঠিক বিরোধিতা এবং প্রায় বিরোধী শূন্য লোকসভা ও বিধানসভা এর মূল কারণ। সুদূর জিয়াগঞ্জ এর সাধারণ টোটো চালক আমাদের দেখে রাস্তার ধার থেকে চিৎকার করে বলছে চলো সবকিছু ছেড়ে এই লাল ঝান্ডাকেই আঁকড়ে ধরি, এরাই আমাদের হাল ফিরাবে। কালিয়াচকের মানুষের কত প্রশ্ন? পথ চলতি অটোর ভেতর থেকে এক সওয়ারই বললেন, তোমরা তো মাইনে পাও। সঙ্গে সঙ্গে অটোচালক উত্তর দিলেন উনারা মাইনে পেলেই হবে, উনারা যদি ঠিক মতন মাইনে না পান আমরা কী পাব, আমাদের চলবে কিভাবে? এই যে বোধ এটাই আমাদেরকে পথ চলতে উদ্দীপ্ত করেছে। বহু মানুষের বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তোমরা কারা গো? কোত্থেকে এয়েছো? উত্তর দিতে হয়েছে তাদের প্রশ্নের আমরা কারা কেন এসেছি কী আমাদের দাবি শুধু সরকারী কর্মচারীদের দাবি দাওয়া নয় সাধারণ মানুষেরও দাবি-দাওয়া তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কত শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী আজকে চাকুরীর পরীক্ষা দিয়েছে তাদের রেজাল্ট জানতে পারেনি পথ হেঁটেছে আমাদের সঙ্গে। কেউ ভাগ করে নিয়েছে তার অভিজ্ঞতা। তার বড় দিদিটা রাস্তায় বসে আছে কলকাতায় একটা চাকরি আশায়। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী, কৃষক, শ্রমিক, চা বাগানের কর্মচারী, পাথর খাদানের শ্রমিক, কয়লা খাদানের খেটে খাওয়া মানুষ, চাকুরীরত কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত মানুষ, সবাই বুঝতে শিখছেন মুক্তি আন্দোলনের একটাই পথ এই লাল ঝান্ডা। হয়তো কোন পদে নেই, হয়তো ক্ষমতায় নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা বলার জন্য এগিয়ে আসে লাল ঝাণ্ডারাই। এই ঝান্ডার মানুষদের আরো বেশি করে সমর্থনের প্রয়োজন মনে হয় গ্রাম বাংলার মানুষরা ক্রমশ উপলব্ধি করছেন, এটাই হোক আমাদের আগামীর পাথেয়। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

নবান্ন অভিযান

সংগঠনের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়। ১৩ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি রাজশেখর মান্ধার বেঞ্চ সংগঠনের দাবি মতো হাওড়া স্টেশনের ফেরী ঘাট থেকে নবান্ন সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত কিছু শর্তসাপেক্ষে মিছিল ও সমাবেশ করার অনুমতি দিলে রাজ্য সরকার-এর বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দারস্থ হয় এই অভিযানকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ ১৪ মার্চ তাদের রায়ে সিঙ্গল বেঞ্চের সিদ্ধান্তকেই বহাল রেখে কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের চাহিদামতো নবান্ন অভিযান কর্মসূচী করার অনুমতি প্রদান করে। হাওড়া ফেরীঘাট থেকে শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের দৃপ্ত মিছিল শুরুর প্রাক্কালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি একটি ঐতিহ্যশালী সংগঠন, যারা শুধুমাত্র কর্মচারীদের দাবি নিয়ে লড়াই আন্দোলন করে না। তারা সাধারণ মানুষের জনগণের দাবি নিয়েও রাস্তায় নামে। ফলে সেটা তাদের ডেমোক্রেটিক রাইটস, সাংবিধানিক অধিকার, সেই অধিকারবলেই তারা আন্দোলন করতে পারেন। তা সত্ত্বেও যখন বাধা তৈরি করা হয়েছে হাইকোর্টে এটা উল্লিখিত হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজভবনের সামনে মঞ্চ বানিয়ে বসেন, যখন রেড রোডে ধর্ণা দেন মঞ্চ সাজিয়ে তখন তো কোথাও পারমিশন নেন না। তাহলে এই কর্মচারী সংগঠন তারা পারমিশন নিয়ে, অনুমোদন নিয়ে মিছিল করছে, তাহলে কর্মচারীদের স্বার্থ সেই মিছিলে বাধা দেওয়ার কোনো সাংবিধানিক অধিকার রাজ্য সরকারের নেই। তাই আমাদের যে নির্ধারিত রুট সেই নির্দিষ্ট পথ ধরেই আমরা মিছিল নিয়ে যাব, তার পাশাপাশি মহামান্য আদালত যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশকে মান্যতা দেওয়াও আমাদের দায়িত্ব। কারণ সেই জাজমেন্ট-এ তারা পরিস্কার বলেছেন যে পিসফুল র‍্যালি, শান্তিপূর্ণ মিছিল তৈরি করার সংগঠিত করার অতীত ঐতিহ্য এ সমস্ত সংগঠনের আছে। মহামান্য চিফ জাস্টিস বলেছেন যে আমি বিশ্বাস করি আজকে যে র‍্যালি হবে, সেটাও শান্তিপূর্ণ আকারেই তারা মিছিল সংগঠিত করনে, তাদের দাবিতে সোচ্চারিত হবেন। তারা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব দাবি নিয়ে লড়াই আন্দোলন করছেন না। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের দাবিকে যুক্ত করে নিয়ে আন্দোলন করছেন। তাই আমরা মনে করি গত ২৩ দিন ধরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে মানুষের দাবি নিয়ে যে অধিকার যাত্রা সংগঠিত হয়েছে বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার সিতাই থেকে শুরু করেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পথ দেখিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, এটা ঠিক। কিন্তু রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের প্রত্যেকটি সংগঠন এই কর্মসূচী সফল করতে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা মিছিলে পা মিলিয়েছেন। যেমন ভাবে মিছিলে পা মিলিয়েছেন রাজ্যের ছাত্র, যুব, মহিলা, যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন সংগঠিত করছেন রাজ্য সরকারের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। মানুষকে সচেতন করছেন তারাই সেই মিছিলে, সেই অধিকার যাত্রায় পা মিলিয়েছেন। আমরা মনে করি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে অধিকার যাত্রা, হকের দাবিতে অধিকার পাওয়ার জন্য যে ন্যায্য সংগ্রাম সেই সংগ্রাম নবান্নের চোদ্দ তলার বুকে কাঁপন ধরাতে পেরেছে। পেরেছে বলেই রাজ্যের প্রশাসন, রাজ্যের পুলিশ তারা নানান অছিলায় এই নবান্ন অভিযান কর্মসূচীকে বানচার করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। হয়তো সুযোগ থাকলে, ক্ষমতা থাকলে তারা সুপ্রিম কোর্টেও যেতেন।

পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশ মতো এক লাইনের লাল পাতাকায় সুসজ্জিত দাবি পোষ্টার, বডি পোস্টার সম্বলিত শ্লোগানে মুখরিত হাজার হাজার মেহনতীর মিছিল শুরু হয় যার গন্তব্য নবান্ন। দীর্ঘ প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের বঙ্কিম সেতু, ডিএম অফিস, জিটি রোড ধরে নবান্নের বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছোয়। এই কর্মচারী সমাবেশে বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ট্যাবলো থেকে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিণতি হয়েছে এটাই যে মানুষ তার মত প্রকাশের স্বাধীন অধিকার, শান্তিপূর্ণ জমায়েত করতে পারবে। এ নিয়ে মামলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও বলেছে যে শান্তিপূর্ণ জমায়েতের ক্ষেত্রে আমাদের কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কলকাতা হাইকোর্ট ইতিপূর্বে একটা মামলায় ডিভিশন বেঞ্চ-এ আমরা এ সওয়াল করেছি কেন অনুমতি নেব? আমরা যেহেতু সভ্য সমাজে বসবাস করি, আমরা দায়িত্বশীল নাগরিক, তাই আমরা প্রশাসনকে জানাই যাতে প্রশাসনও তৈরি থাকেন কোনোরকম অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে। কিন্তু প্রশাসন যদি মনে করে যে তাদের কাছে আমরা জানাচ্ছি তাদের অনুমতির জন্য, তাহলে প্রশাসন ভুল করছেন। পুলিশের মাথা আমলারা জেনে রাখুন, আপনারা যদি এরকম আমাদের কোনও মিছিল মিটিং করবার ক্ষেত্রে বার বার বাধা সৃষ্টি করেন, আগামীদিন এমন পর্যায় আসবে যখন আপনাদের অনুমতির জন্য কেউ অপেক্ষা করবে না। মানুষ জমায়েত হয়ে রাস্তায় জনপ্লাবন আপনাদের বাধ্য করবে—এটা আইন, এটা সংবিধান।

তিনি আরও বলেন আজকে জমায়েত যাতে না হয় তার জন্য সরকাব, দায়বদ্ধ আপনাদের কাছে, আপনাদের পয়সায় আমাদের পয়সায়, করের টাকায় তারা আদালতে যাচ্ছেন। কী উদ্দেশ্য? একটা নৈতিকতার প্রশ্ন তুলব, এবং আপনারাও তুলুন যে সরকারী টাকায়, জনগণের টাকায় সরকারী কর্মচারীদের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য সরকার কেন পয়সা খরচ করবেন। তিনি তো আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। সবাইকে পুনরায় অভিনন্দন এবং আগামীদিনের সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য আহ্বান জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

কর্মসূচী চলাকালীন মুখ্য সচিবের উদ্দেশ্যে প্রেরিত কর্মচারীদের দাবি স্বাক্ষর সম্বলিত ডেপুটেশন পুলিশের পক্ষ থেকে নবান্নে গিয়ে জমা দেওয়া হয়। যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বরা বলেন, গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে আজকে আমরা নবান্নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছোলাম, আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা সরকারকে বাধ্য করবো মেহনতী জনগণ ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অভাব-অভিযোগ মেটাতে। □

কর্মচারীদের দাবি-স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করছে যৌথ মঞ্চের নেতৃবৃন্দ

দেবাশীষ রায়

'অধিকার যাত্রা'র সমাপ্তি সমাবেশ

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হওয়া অধিকার যাত্রা সুদূর কোচবিহার থেকে যাত্রা শুরু করে দীর্ঘপথ পেরিয়ে ১০ মার্চ, রবিবার যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডে এসে সমাপ্ত হয়। শেষ পর্যায়ে গড়িয়া শীতলা মন্দির থেকে যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সুসজ্জিত মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মিছিলে সামিল হয়েছিলেন কর্মরত কর্মচারীদের সঙ্গে অবসরপ্রাপ্তরাও। সামিল হয়েছিলেন চুক্তিভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীরাও। যাদবপুর ৮-বি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সুপার মার্কেটের নিকটে অধিকার যাত্রার সমাপ্তি উপলক্ষে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশের শুরুতে রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির পক্ষ থেকে ৮ জন স্থায়ী পদযাত্রীসহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদককে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। সম্বর্ধনা প্রদান করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অরুণা ঘোষ, সভাপতি খগেন চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক কাঞ্চন মুখার্জীসহ সংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ভানুদেব চক্রবর্তী।

অধিকার যাত্রার সমাপ্তি সমাবেশে দীর্ঘ ২৩ দিন যাত্রার সহযাত্রী কেন্দ্রীয় বাসের দুই পরিবহন শ্রমিক—বাবলু রায় ও সুকুমার রায়কে সম্বর্ধনা জানানো হল

এরপর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে অধিকার যাত্রার সমাপ্তি সমাবেশ শুরু হয়। সমাপ্তি সমাবেশ সভার সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মানস দাস। সমাবেশের শুরুতে স্থানীয় শিল্পীদের তরফ থেকে গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অভিনেতা বাদশা মৈত্র, গণ আন্দোলনের নেতা সৃজন ভট্টাচার্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ মঞ্চে উপস্থিত থেকে আবৃত্তি পরিবেশন করেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রী রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগঠনের পক্ষ থেকে এঁদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

অভিনেতা বাদশা মৈত্র কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষের দাবী নিয়ে সারা রাজ্যজুড়ে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যাঁরা এই দীর্ঘ ২৩ দিন ধরে হেঁটে এসেছেন, তাঁদের এই হাঁটা, এই শ্রম আগামীদিনে রাজ্যের হাজার হাজার মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে। যে দাবীগুলো নিয়ে কর্মচারীরা মিছিলে শামিল হয়েছেন সে দাবী শুধু কর্মচারীদের নিজেদের দাবী নয়, তা আসলে সাধারণ মানুষের দাবী। যে মিছিল থেকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানানো হয়, সে মিছিল শুধু একটি সংগঠনের হতে পারেনা, সে মিছিল আসলে সাধারণ মানুষের। তিনি আরও বলেন, যতই জাত-ধর্ম থেকে বিভিন্ন কৌশলে আমাদের ভাবনাকে তাড়িত করবার চেষ্টা চলুক না কেন মানুষের মূল সমস্যা তাঁদের জীবন-জীবিকার। এই দাবী নিয়েই কর্মচারীরা আজ রাজপথে। এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষকেও সামিল হবার আহ্বান জানান শ্রী মৈত্র।

গণ আন্দোলনের নেতা সৃজন ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন যে ছাত্রযুবদের দাবী আর কর্মচারীরা যে যে দাবী নিয়ে অধিকার যাত্রায় সামিল হয়েছেন তা আলাদা নয়। কর্মচারীদের ডিএ বঞ্চনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে রাজ্য সরকার তার কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ দেবার ক্ষেত্রে অক্ষমতা এবং অনীহা দেখালেও মন্ত্রী, বিধায়কদের ভাতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো অনীহা দেখায় না। তিনি আরও বলেন যে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে যে শাসকদল রয়েছে তারা আমাদের রুটি-রুজির প্রশ্নে যত্নবান নয়। চাকরি চুরি সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয়েও সরব হন কমরেড সৃজন। তিনি বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এই অধিকার যাত্রা লড়াই, আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

সমাপ্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী দীর্ঘ ২৩ দিন ধরে ২২ টি জেলা অতিক্রম করা 'অধিকার যাত্রা'র বিভিন্ন পর্যায়ে হওয়া অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন এই অধিকার যাত্রা কেবল সরকারী কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে নয়, এ অধিকার যাত্রা ছিল আসলে এরাজ্যের সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়াকে তুলে ধরার যাত্রা। তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন কিভাবে এই ২৩ দিনে সুদূর কোচবিহারের সিতাই ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ থেকে পাহাড়ের, ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিক, উত্তর বা দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রান্তিক কৃষক, মালদা-মুর্শিদাবাদের ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষ থেকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া কিংবা ঝাড়গ্রামের প্রান্তিক মানুষ, বিভিন্ন সন্ত্রাস কবলিত এলাকার কর্মচারী থেকে সাধারণ মানুষ এই অধিকার যাত্রাকে বরণ করে নিয়েছে, সাহায্য, সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, অধিকার যাত্রার সঙ্গী হয়েছে। তিনি সংগঠনের পক্ষ থেকে যে যে গণসংগঠন ও সংস্থা এই অধিকার যাত্রার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তাঁদের অভিনন্দন জানান।

সমাপ্তি সমাবেশের মঞ্চ থেকে ১৪ মার্চ যৌথ মঞ্চ আহুত হওয়া নবান্ন অভিযানে সকল অংশের কর্মচারীদের শামিল হবার ডাক দেওয়া হয়।

অধিকার যাত্রার থীম সং এর জন্য সুমন চ্যাটার্জি এবং সুদীপ চক্রবর্তীর হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতিগুলোর পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্যও তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের নেতৃত্বের হাতে।

বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে অধিকার যাত্রার সাথে যুক্ত পদযাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এই সমাপ্তি সমাবেশের মঞ্চে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির হাতে তাদের সঞ্চয় তুলে দেন কর্মচারী পরিবারের সদস্যবৃন্দ। □

দীপঙ্কর বাগচী

শারীরিক ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে অধিকার যাত্রার যাত্রীদের সম্বর্ধিত করলেন পুরুলিয়ার হরিপদ মাহাতো

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।